তত সহজ ছিল না
পার্থসারথি চক্রবর্তী

তত সহজ ছিল না

তত সহজ ছিল না

পার্থসারথি চক্রবর্তী

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৭৮ চতুর্থ মুদ্রণ ডিসেম্বর ১৯৮৬

প্রচ্ছদ মদন সরকার

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব কর্তৃক
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা ৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক পি ২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম
নং ৬ এম কলিকাতা ৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ৬·০০

শ্রীপরিতোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শিক্ষা-সচিব, পশ্চিমবঙ্গ
—করকমলেষু

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের বিজ্ঞানের বই ঃ

কেমিক্যাল ম্যাজিক
চিকিৎসা বিজ্ঞানের আজব কথা
রসায়নের ভেলকি
ম্যাজিকের মতো মজা
মজার এক্সপেরিমেণ্ট
বুদ্ধি নিয়ে দারুণ মজা
বিজ্ঞানের বিচিত্র বার্তা

সূচীপত্র

গোড়ার কথা

আজকাল আমরা অনেক জিনিষ খুব সহজেই পাই। কিন্তু আগেকার দিনে তা পাওয়া খুব সহজ ছিল না। তার জন্য খাটতে হয়েছে অনেক।

সভ্য হওয়াই কি মানুষের পক্ষে সহজ ছিল? আদিম কালের মানুষ বাস করত বনে, পাহাড়ের গুহায়। মানুষের বেঁচে থাকাটাই ছিল তখন খুব কঠিন কাজ। বনের বাঘ-ভালুকের সঙ্গে কি মানুষ বাস করতে পারে? মানুষকে তখন কেবল পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হত। তবে হ্যাঁ, তাদের মাথা ছিল। মাথা ছিল বলেই মানুষ কত কৌশলে নিজেদের বাঁচাতে পেরেছে। কেবল বাঁচানই নয়—মানুষ বন কেটে নগর বসিয়েছে। বনের পশু মানুষের ভয়ে পালিয়েছে। মানুষ সমাজ বেঁধে বাস করতে শিখেছে, সভ্য হয়েছে। মানুষ লেখাপড়া শিখেছে, কত কি তৈরি করেছে। এগুলি কি খুব সহজে হয়েছে? কত হাজার হাজার বছর ধরে গায়ে খেটে, মাথা খাটিয়ে তবেই না সেই বনের মানুষ এখনকার সভ্য মানুষ হতে পেরেছে। এর জন্য দেশের গণ্যমান্য লোকদের দান কম নয়।

এখন আমরা ধাঁ করে আলো জ্বালি, অনেক দূরের লোকের সঙ্গে কথা বলি, দরকার মত যে কোনও বিষয়ের বই পড়তে পাই। আমরা এখন রেলের গাড়ীতে চেপে হুস্ হুস্ করে দেশ-বিদেশে চলে যাই। এখন বোঁ করে আকাশে উড়ে আমরা চাঁদের দেশেও যেতে পারি!

কিন্তু আগেকার লোকদের কাছে এসব সহজ ছিল না। এর অনেক জিনিষের কথা তারা ভাবতেও পারেনি তখন। তাদের সময়ে কি ছিল না আর এখন কি হয়েছে তা' জানলে এখনকার সুবিধার কথা ভালো বুঝা যাবে। সেই সুবিধা নিয়ে আমাদের আরও এগিয়ে যেতে হবে।

আগুন জ্বালানো

ঝড়, বন্যা, আগুন—এগুলিকে বনের পশুরা যেমন ভয় করে, মানুষও তেমনি ভয় করত একদিন। আগুন দেখলেই সবাই ভয়ে পালাত। অনেক সময় গভীর বনের শুকনো কাঠে কাঠে ঘষা লেগে আগুন জ্বলে উঠত। তাতে বনের অনেকখানি জায়গা দাউ দাউ করে পুড়ে ছাই হয়ে যেত। বনের পশুরা তা' দেখে ভয়ে পালাত। মানুষ কিন্তু ভাবতে লাগল, কেন এই আগুন জ্বলে? সে দেখল, দুই হাতের তালু একসাথে ঘষলে হাত গরম হয়। শুকনো কাঠে কাঠে ঘষা লাগলে কাঠ গরম হয়ে আগুন জ্বলে। তখন তারা শুকনো কাঠে কাঠে ঘষা লাগিয়ে নিজেরাই আগুন জ্বালাতে শিখল।

কিন্তু এভাবে আগুন জ্বালতে সময় লাগত খুব। অসুবিধাও ছিল অনেক।
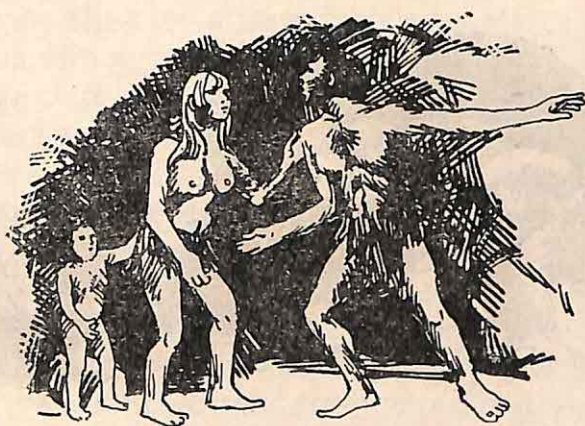
আগুন দেখে ভয়

একদিন কি ভাবে একটা পাথরের সাথে আর একখানার ঘষা লেগে হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠল। মানুষ থ হয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখল। সে ঐ পাথর নিয়ে আবার ঘষল। ঐ পাথরটা ছিল চকমকি পাথর।

ঘষা লেগে আগুন জ্বলল। শুকনো পাতায় সে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

আগুন দেখে তারপর মানুষ আর ভয়ে পালায় না। সে নিজেই আগুন জ্বালতে পারে। এতে তার খুব বড় একটা সুবিধাও হয়ে গেল। রাতের বেলা চারদিকে শুকনো কাঠে আগুন জেবলে তার মাঝখানে মানুষ নির্ভয়ে ঘুমাতে পারত। আগুন দেখে বাঘ-ভালুক কাছে ঘেঁষত না।

আঁধারে মানুষ ভয় পেত। আগুন জ্বাললে আলো হয়ে যেত চারদিক। তখন আর ভয় থাকত না।

কিন্তু সব সময়ে শুকনো কাঠ ঘষে বা পাথর ঠুকে আগুন জ্বালানোয় অসুবিধা ছিল খুব। মানুষ ভেবে দেখল, যদি সব সময়ের জন্য এক জায়গায় আগুন জেবলে রেখে দেওয়া যায়, তা হলে তার থেকে সহজেই আগুন পাওয়া যেতে পারে। আগুনই মানুষকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। তাই মানুষ তখন থেকে আগুনকে দেবতা বলে পূজা করতে লাগল। রোজ আগুনের পূজা করা ছিল তখন পুণ্য কাজ। যাঁরা এই পুণ্য করতেন, তাঁরা আগুনকে এক জায়গায় রেখে কাঠ দিয়ে দিয়ে সব সময়ের জন্য ওটা জ্বালিয়ে রাখতেন।
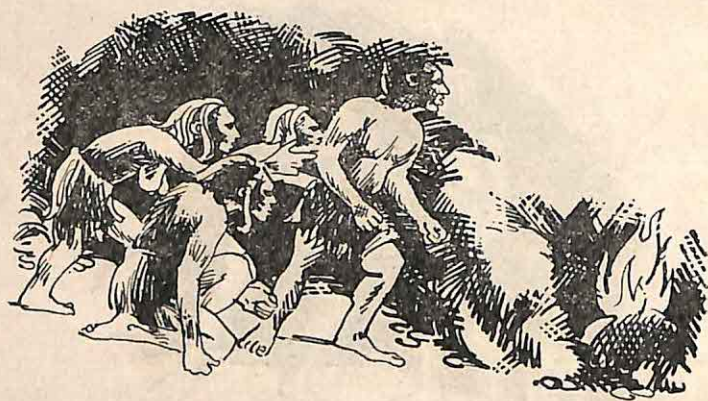
পাথরে পাথরে ঘষা লেগে আগুন জ্বলছে

এতেও কিন্তু আগুনের অভাব মিটল না। আগুন আমাদের এত দরকারী যে, সব সময় সব জায়গাতেই ওটা পাওয়া চাই। দরকার পড়লে মানুষের মাথা খাটাতে হয়। মাথা খাটিয়ে মানুষ মোমবাতি, তেলের প্রদীপ জ্বালতে শিখল। কিন্তু মোমবাতি বা প্রদীপ

জ্বালতেও আগুন চাই আগে। সে আগুন সহজে কি করে পাওয়া যায়?

একশো বছর আগেও আমাদের দেশে মাটির মালসায় করে তুষ আর ঘুঁটের আগুন ধরিয়ে রাখা হত। ওটা দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে না। অনেক সময় ধরে ওটা ধীরে ধীরে পোড়ে। এখনকার দিয়াশলাইয়ের কাঠিতে যেমন বারুদের মত একটা জিনিষ মাখানো থাকে, তখন তেমনি খুব সরু সরু পাটকাঠির মাথায় ঐভাবে গন্ধক মাখিয়ে রাখা হত। একটা বাঁশের চোঙের ভিতর থাকত এইসব কাঠি। দরকারের সময়ে কাঠির ঐ গন্ধক মাখানো মাথাটা তুষের আগুনের ভিতর চেপে ধরলেই কাঠিটা জ্বলে উঠত। ওটাকে বলা হত—দীপকাঠি।

কিন্তু এতেও সব অসুবিধা গেল না। পথেঘাটে আগুন জ্বালতে তো মানুষ তুষের মালসা আর বাঁশের চোঙ ঘাড়ে করে বেড়াতে পারে না! অবশেষে মানুষ অনেক রকম মাথা খাটিয়ে বের করল দিয়াশলাই। এখন যেখানে-সেখানে, যখন-তখন আমরা দিয়াশলাইয়ের কাঠি দিয়ে আগুন জ্বালতে পারি।

মোমবাতি বা তেলের প্রদীপ জোর বাতাসে সহজেই নিবে যায়। আগে এজন্য হাঁড়ির মধ্যে মাটির প্রদীপকে সরা চাপা দিয়ে রাখা হত। কিন্তু এই হাঁড়ি ঘাড়ে করে তো আর চলাফেরা করা চলে না! এজন্য তৈরি হল লণ্ঠন ও হ্যারিকেন। কেরোসিন তেল দিয়ে এই আলো জ্বালানো হয়। এখন আমরা খুব সহজেই এই আলো জ্বালি। কিন্তু প্রথম প্রথম এই কেরোসিনের আলো জ্বালানো খুব সহজ ছিল না।

এক দাদামশায়ের কাছে গল্প শুনেছি:

পুজোর সময় কলকাতা থেকে প্রথম যেদিন তাঁদের গাঁয়ে কেরোসিন তেল এল, সেদিন কী সমারোহ! বোধহয় কোন সার্কাসের দল গাঁয়ে এলেও এতখানি সাড়া পড়ে না। রাত হলে টিনের কুপীতে আলো জ্বালানো হবে। গাঁয়ের ছেলেরা কখন রাত হবে কেবল সেই কথাটা ভাবতে লাগল। মা-পিসীরা মহা ভাবনায় পড়লেন, কি জানি সেই বিলাতী তেলে যদি একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটে যায়; পুজোর ঘরে তাঁরা ঐ কেরোসিনের টিনটা তুলতে নারাজ। ওর ভিতর কোন্ অপদেবতা ভর করে আছে কে জানে?

অবশেষে রাত হল। একজন সাহস করে কুপীটায় পলতে পরিয়ে তেল পুরে দিল। গাঁয়ের লোক অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু ঐ পলতেয় আগুন ধরাবে কে? একটি ছেলে রাজী

ছিল, কিন্তু তার পিসীমা পৈ পৈ করে তাকে বারণ করলেন। ওতে একটা অঘটন ঘটতে পারে। এমন ভয়ানক কাজ যেন সে না করে। সে বাপের একই ছেলে।

অবশেষে একটি সাহসী লোক লাঠির মাথায় আগুন ধরিয়ে দূর থেকে পলতেটায় আগুন ধরিয়ে দিল। যারা তাকে ঘিরে ধরেছিল তারা অমনি ভয়ে দূরে সরে গেল।
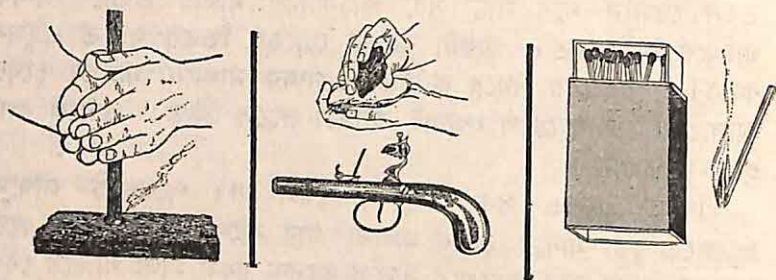
কাঠে কাঠে ঘষা লেগে আগুন; পাথরে ও স্টীলের ঘষায় আগুনের ফুলকি; আধুনিক দেশলাই

আলো জ্বললে তারা দেখল, হ্যাঁ, আলো বটে। কী তার তেজ! কালো ধোঁয়া ছাড়ছিল সেই আগুনের শিখা। কেউ কেউ বলল, ইংরেজ জাতটার মাথা আছে খুব।

এখন আমরা সুইচ টিপে ধাঁ করে বিজলীবাতি জ্বালি। এটা আজকাল কতই সহজ আমাদের কাছে। অথচ আগেকার দিনে এই বিজলীবাতির কথা কেউ ভাবতেও পারেনি। সহজেই কি মানুষ এই বিদ্যুৎ-শক্তিকে আবিষ্কার করতে পেরেছে? কত রকম মাথা খাটাবার পর আমরা এই বিজলীবাতি ব্যবহার করতে শিখেছি।

কেবল বাতিই নয়। গত একশো বছরে যত সব বড় বড় আবিষ্কার হয়েছে, তার মূলে রয়েছে বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ যেন আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ; যা চাওয়া যাবে তাই-ই পাওয়া যাবে। আলো জ্বালাতে, পাখা ঘুরাতে, সিনেমা দেখাতে, দূরে খবর পাঠাতে, রেডিও চালাতে, আকাশে উড়তে—সব তাতেই বিদ্যুৎ।

এই বিদ্যুৎ-শক্তিকে কাজে লাগাতে মানুষের অনেক অনেক দিন ধরে নানা রকমে চেষ্টা করতে হয়েছে।

বেন্‌জামিন নামে এক সাহেব ঘুড়ি উড়াতে গিয়েছিলেন। আকাশে তখন বিদ্যুৎ খেলছিল। জলে ঘুড়ির সুতো গিয়েছিল ভিজে। লাটাইতে লাগানো ছিল অনেকটা তামা। তামার ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ

খুব সহজেই চলতে পারে। আকাশের বিদ্যুৎ ভিজে সুতো আর তামার ভিতর দিয়ে মারল সাহেবকে জোর এক ধাক্কা। সাহেব ধাক্কা খেলেন, কিন্তু এর থেকেই বিদ্যুৎশক্তি আবিষ্কারের পথ খুলে গেল।

রিচম্যান নামে আর এক সাহেব পরীক্ষা করবার জন্য ঐভাবে ঘুড়ি উড়াতে গিয়ে হঠাৎ বিদ্যুতের এমন এক ধাক্কা খেলেন যে, তাতেই তাঁর জীবন শেষ হল!

ইটালী দেশের অধ্যাপক গ্যালভানি একদিন দেখলেন নুনজলে ভিজানো যে মরা ব্যাংটি একটা তামার তার দিয়ে ঝুলানো ছিল, বাতাসের দোলায় যেই সেটি লোহার রেলিংয়ে লাগছে, অমনি সেই মরা ব্যাং লাফিয়ে উঠছে!

কেন এমন হয়? নুন, জল, তামা ও লোহা এরা এক সাথে মিশলে একটা শক্তি তৈরি হয় কি?—দিনরাত তিনি এই নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা করতে লাগলেন।

লোকে তাঁকে দেখলে উৎসাহ করে বলতে লাগল, ব্যাং-নাচানে অধ্যাপক! একদিন তাঁর কাছে একজন জানতে চাইল, আচ্ছা মরা ব্যাং না হয় নাচল, কিন্তু তাতে হল কি?—মানুষের কি দরকারে ওটা আসবে?

গ্যালভানি এর জবাব দিতে পারেননি। তবু সারাজীবন তিনি এই নিয়ে আলোচনা করেছেন।

অবশেষে ভোল্টা নামে তাঁরই এক বন্ধু ওর থেকেই বিদ্যুৎ-শক্তি পাওয়ার কৌশলটা ধরতে পারেন। তিনিই সকলের আগে ব্যাটারী তৈরি করেন।

এরপর থেকেই নানাদিক থেকে বিদ্যুৎ সম্বন্ধে আলোচনা করে নানাভাবে বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া গিয়েছে। আজ আমরা বিদ্যুৎকে অনেক অনেক কাজে লাগাতে পারছি। এখন বিদ্যুতের ব্যবহার কত সহজই না মনে হয়!

সময় জানা

ক'টা বাজে ?—তিনটা বেজে তের মিনিট।

ঘড়ির দিকে একনজর তাকিয়ে এখন আমরা ধাঁ করে সময়টা বলে দিতে পারি। কিন্তু আগেকার দিনে সময় জানা মোটেই সহজ ব্যাপার ছিল না।

আদিম কালের মানুষ সময়কে জানত—দিন আর রাত এই দুই রকমে।
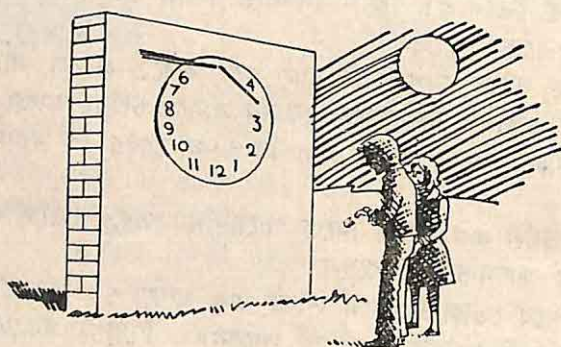
সূর্য-ঘড়ি

তারপর তারা দেখল, সূর্য কখনও ওঠে, কখনও মাথার উপরে আসে, আবার কখনও অস্ত যায়। এর থেকে তারা দিনের বেলাকে সকাল, দুপুর আর বিকাল এই তিন ভাগে ভাগ করে নিল। এখনও আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে, বেলা তখন মাথার উপর, বেলা তখন পড়ে গেছে অথবা বেলা তখন ডুবু-ডুবু।

গুহাবাসী মানুষেরা দেখল, গাছপালা ও পাহাড়-পর্বতের ছায়া পড়ে। এই ছায়া কখনও বড় হয়, কখনও ছোট হয়, আবার কখনও ছায়া একেবারেই থাকে না। দিনের কোন্ সময়ে কি রকমের ছায়া হয়, দেখে দেখে তারা তা বুঝতে পারল। এরপর তারা ফাঁকা জায়গাতেও একটা কাঠি পুঁতে তার ছায়া দেখে দিনের বেলার সময়টা আঁচ করে নিতে পারত। রাতের বেলায় আকাশের নক্ষত্র দেখে দেখে

তারা অনেক কিছু জেনে গিয়েছিল। নক্ষত্র দেখে বুঝতে পারত—রাত কতখানি হয়েছে।

কিন্তু বর্ষাকালে মেঘলা আকাশে তো নক্ষত্র দেখা যায় না, সূর্যের ছায়াও পাওয়া যায় না—তখন কি হত ?

হ্যাঁ, সেজন্য তারা মাথা খাটিয়ে বের করেছিল, মোমবাতি-ঘড়ি, দড়ি-ঘড়ি, জল-ঘড়ি, বালি-ঘড়ি, এইসব। কলকব্জার ঘড়ির কথা তখন তারা ভাবতেও পারেনি।

মোমবাতি-ঘড়ি : একটা মোমবাতি কত সময়ে কতখানি পোড়ে আগে থেকে জেনে নিয়ে, সেই অনুসারে লোকে মোমবাতির গায়ে দাগ কেটে রাখত। তার থেকে বাতি পুড়লে সময় জানা যেত।

দড়ি-ঘড়ি : পান-বিড়ির দোকানের পাশে নারকেলের ছোবড়ার আধ-পাকানো দড়িতে আগুন ধরানো থাকে আজকাল। আগেকার দিনে ঐ রকম একটা দড়িতে আগুন ধরিয়ে আগে দেখা হত—কত সময়ে কতখানি দড়ি পোড়ে। ততখানি অংশে একটা করে গিঁট দেওয়া থাকত। এই গিঁট গুণে লোকে বুঝত কতটা সময়ে কতগুলি গিঁট পুড়েছে। তার থেকে সময় জানা যেত।

জল-ঘড়ি : আজকাল কোন কোন বাড়ীতে বৈশাখ মাসে মাটির
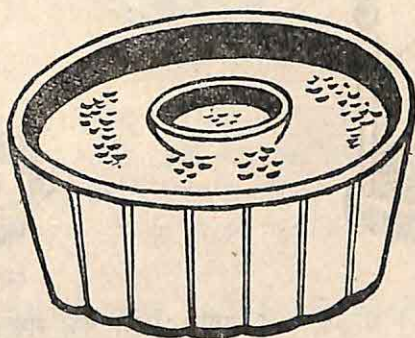
জল-ঘড়ি

ঘটের তলায় ছিদ্র করে তার মধ্যে উলুখড় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তারপর ঐ ঘটে জল রেখে তুলসীগাছে ফোঁটা ফোঁটা করে জল দেওয়া হয়। ঐভাবে আগে সময় জানবারও ব্যবস্থা ছিল। একটা কলসীতে ছিদ্র করে তার মধ্যে জল রাখা হত। ঐ জল ফোঁটা ফোঁটা ক'রে পড়ত নীচের আর একটা কলসীতে। একটা কলসীর জল খালি

হতে যতটা সময় লাগত তার থেকে সময় জানা যেত।

বালি-ঘড়ি : আগেকার দিনে কাঁচ দিয়ে এমন একটি পাত্র তৈরি করা হত, যার মাঝখানটা বেশ টেপা। সেখানে একটা ছিদ্র থাকত। পাত্রটির উপরের অংশটায় বালি রেখে দিলে ঐ ছিদ্রপথে ঝুর ঝুর করে বালি পড়ত গিয়ে পাত্রের নীচের অংশটিতে। এইভাবে উপরের অংশটার সব বালি পড়ে গেলে পাত্রটিকে উলটিয়ে বসিয়ে দিলেই চলত। পাত্রের উপরের অংশটা খালি হতে যে সময় লাগত তার থেকেই সময় জানা যেত।
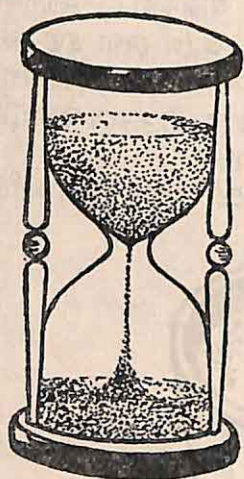
বালি-ঘড়ি
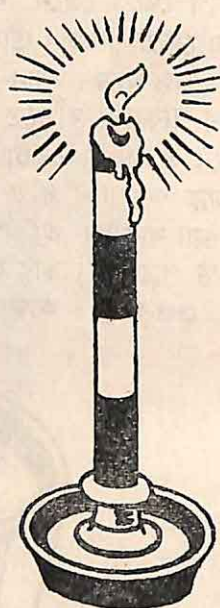
মোমবাতি-ঘড়ি

কিন্তু এইসব ঘড়ির অসুবিধাও ছিল কম নয়। মোমবাতি সব সময়ে সমান জ্বলে না। বাতাস বেশি থাকলে বাতিটা তাড়াতাড়ি পোড়ে। দড়িও বেশি বাতাসে তাড়াতাড়ি পুড়ে যায়। জল-ঘড়ি বা বালি-ঘড়ির ছিদ্রের মধ্যে একটা কিছু আটকে গেলেই তো সব গোলমাল হয়ে যাবে!

গ্যালিলিও ছিলেন ইটালী দেশের একজন নামকরা লোক। তিনি একদিন এক গির্জায় গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দেখলেন, একটি লোক গির্জার ঝুলন্ত বাতিটা টেনে নিল। একটা দড়ির সাথে ঐ

বাতিটা বাঁধা ছিল। বাতিটা জেবলে ওটাতে ছেড়ে দিলে দ্বলতে লাগল। গ্যালিলিও দেখলেন, বাতিটা দ্বলবার সময় একবার কোলের দিকে আসছে, আর এক বার দূরে সরে যাচ্ছে। প্রথম দিকে দোলনের পাকটা বড় ছিল, ক্রমে সেটা ছোট হয়ে গেল। তিনি বাঁ-হাত দিয়ে
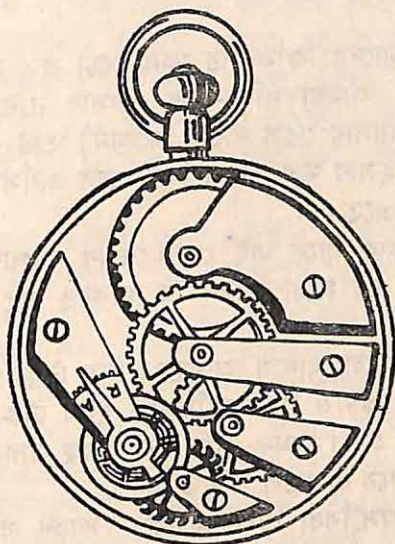
হাতঘড়ির কলকব্জা

তাঁর ডান হাতের নাড়িটার ধ্বকধ্বকানি গ্বণে দেখলেন, দড়িটার বড় পাক দিতে যে সময় লাগে, ছোট পাকেও ঠিক ততটাই সময় লাগে। এর থেকে তিনি আবিষ্কার করলেন—দোলক।

অনেক বছর পরে এই দোলকের সাহায্যেই তৈরি হল দেওয়াল-ঘড়ি।

তারপর অনেকের অনেক বছর চেষ্টার পর তৈরি হল—পকেট-ঘড়ি আর নানারকমের হাতঘড়ি।

কেনা-বেচা করা

আজকাল আমাদের জিনিষপত্র কেনা-বেচা কত সহজেই না হয়ে যায়! দোকানীকে আমরা বলি,—দশ পয়সার নুন, পনর পয়সার হলুদ, কি ষাট পয়সার তেল দাও। দোকানী তার ওজন মত দিয়ে দেয়। আমরাও হিসাব মত পয়সা দিয়ে চলে আসি। কারও কোন অসুবিধা হয় না এতে।

কিন্তু আগেকার দিনে এই কেনা-বেচার ব্যাপারটা খুব সহজ ছিল না। অথচ এর মধ্যে কঠিন কি থাকতে পারে এখন আমরা ভেবেই পাই না!

অতি প্রাচীনকালে মানুষ আমাদের মত টাকা-পয়সার ব্যবহার জানত না। তখন কোনও জিনিষ কিনতে হলে টাকা-পয়সার বদলে অন্য জিনিষ দিতে হত। যেমন—যার নুন আছে তার তেলের দরকার হলে কিছু নুন দিয়ে ঐ তেল কিনত।

এতে কিন্তু অসুবিধা ছিল অনেক। কারণ, যার তেল আছে, তার হয়ত নুনের দরকার নেই। হাঁড়ি-কলসী দিয়ে যার ধান কিনতে হবে, সে হয়ত ওগুলি মাথায় করে ধানওয়ালার বাড়ী গিয়ে শুনল, তার হাঁড়ি-কলসীর দরকার নেই। তখন তাকে ঐ বোঝা মাথায় করে ঘুরে বেড়াতে হত পাড়ায় পাড়ায়—কোন্ ধানওয়ালার হাঁড়ি-কলসীর দরকার আছে তা জানতে!

এইভাবে দারুণ অসুবিধা ভোগ করে মানুষ ভেবে দেখল যে, কোনও একটা মাত্র জিনিষকে মূল্য হিসাবে ধরা হবে।

সবাই ঠিক করল, গরুকেই এই মূল্য হিসাবে ধরা হোক্। তখন সবাই গরু পুষতে চাইত, গরুকে বলা হত—গো-ধন।

এর পর থেকে কোন জিনিষ কিনতে হলে—জিনিষ হিসাবে একটা, দুটো বা বেশি গরু দিতে হত। কিন্তু এতেও অসুবিধা গেল না। একটা গরুর বদলে যদি তিন ধামা সরষে পাওয়া যায়, তাহলে যার এক ধামা সরষের দরকার, সে কি করবে? গরুকে তো আর তিন ভাগ করা যায় না! দরকার না থাকলেও এজন্য তাকে তিন ধামা সরষেই কিনতে হত।

তাছাড়া গরু দিয়েই যদি সব কেনাকাটা করতে হয়, তাহলে বাজার করতে যাওয়ার সময়ও গরুর পাল সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে! সবাই যদি গরুর পাল নিয়ে আসে বাজারে তাহলে সেখানকার অবস্থাটা কি হবে ভেবে দেখ!

কিভাবে এই অসুবিধা দূর করা যায়?

আবার লোকে ভাবতে লাগল। বহুকাল পরে তারা ঠিক করল, গরু-বাছুর নয়, কোনও ধাতুকে দামের মত করে ব্যবহার করতে হবে। ধাতুটা নেওয়াও সুবিধা। খুব অল্প জিনিষ কিনলেও ধাতুটাকে ভাগ করে তার দাম দেওয়া চলবে। তামা, রূপা, সোনা প্রভৃতি নানা ধাতু—যে দেশে যেটা পাওয়া যায়, এরপর ব্যবহার করা চলতে লাগল।

যখন কেনা-বেচা বাড়ল, তখন এতেও অসুবিধা দেখা দিল। প্রত্যেকটি জিনিষ কিনবার পরই তার মূল্য হিসাবে সোনা, রূপা বা তামা প্রভৃতি ওজন করে তার দাম দেওয়া হত। ধাতুটা খাঁটি কিনা তাও পরীক্ষা করে দেখতে হত। এইভাবে একটা জিনিষের দাম দিতেই বেশ খানিকটা সময় লাগত। ঝগড়াঝাঁটিও হত।

যখন কেনা-বেচা আরও বেড়ে গেল, তখন মানুষ একটা নির্দিষ্ট ওজনের ধাতুর চাক্‌তি ব্যবহার করতে লাগল। এক তোলা, আধ তোলা, সিকি তোলার ধাতুর চাক্‌তি তৈরি থাকত, লোকে তাই দিয়ে তাদের জিনিষের দাম দিত। প্রত্যেকবার চাক্‌তিটাকে ওজন করবার দরকার হত না।

কিন্তু দেশে চিরকালই ভালো-মন্দ দু'রকম লোকই আছে। খারাপ লোক যারা, তারা কম ওজনের ধাতুর চাক্‌তি বেশি ওজনের বলে চালিয়ে দিত অথবা কম দামের অন্য ধাতু ঐ চাক্‌তিতে মিশিয়ে ওজনটা ভারী করত।

এরপর ঠিক হল, ঐ সব ধাতুর চাক্‌তির উপর বিখ্যাত ও বিশ্বাসী লোকের ছাপ থাকবে, যাতে সবাই বুঝতে পারে যে, ঐ সব ধাতুর চাক্‌তি খাঁটি। এজন্য তখন দেশের রাজার নাম বা তাঁর ছাপ ব্যবহার করা হত। এইভাবে ধীরে ধীরে আমাদের টাকা-পয়সার প্রচলন আরম্ভ হল। আমাদের টাকা-পয়সায় একটা নির্দিষ্ট ওজনের ধাতু থাকে। ওর উপর বিখ্যাত লোকের ও সরকারের ছাপ থাকায় আমরা কোন সন্দেহ না করে ওগুলি ব্যবহার করতে পারি।

দেখা গেল, দু-চার হাজার ধাতুর টাকা-পয়সা বয়ে নিয়ে যাওয়া খুবই অসুবিধা। এজন্য পরে একরকম কাগজের নানারকমের 'নোট'

তৈরি হল। হাজার টাকা বা একশো টাকার নোট অনেকগুলি বয়ে নিয়ে যাওয়া কিছুই কঠিন নয়।

কিছুকাল আগেও আমাদের দেশে টাকা-আনা-পাইয়ের চলন ছিল। ওটার হিসাব করতে বেশ অসুবিধা হত। পাইকে বারো দিয়ে ভাগ করে আনা, আবার আনাকে ষোল দিয়ে ভাগ করে টাকা করতে হত। এতে সময়ও লাগত অনেক।

এখনকার টাকা-পয়সার হিসাব তার চেয়ে অনেক সহজ।

'ব্যাঙ্ক'ও আমাদের টাকা-পয়সার লেনদেন ব্যাপারে অনেক সুবিধা করে দিয়েছে।

এখন এগুলি খুব সহজ মনে হলেও এটা আবিষ্কার করতে মানুষের শত শত বছর লেগেছে!

হাতের কাজের যন্ত্রপাতি পাওয়া

নানারকম হাতের কাজ করতে হয় আমাদের। চাষের কাজ, কাঠের কাজ, লোহার কাজ, ঘরের কাজ এইসব। বিভিন্ন কাজে আমাদের নানা ধরনের যন্ত্র লাগে। মাটি কোপাতে কোদাল, কাঠ কাটতে কুড়ুল, কাঠ চেরাই করতে করাত আমাদের চাই। তাছাড়া হাতুড়ী, মুগুর, সাঁড়াশী, বাটালী, হিসকাপ, তুরপুণ এসব আমরা বিশেষ বিশেষ
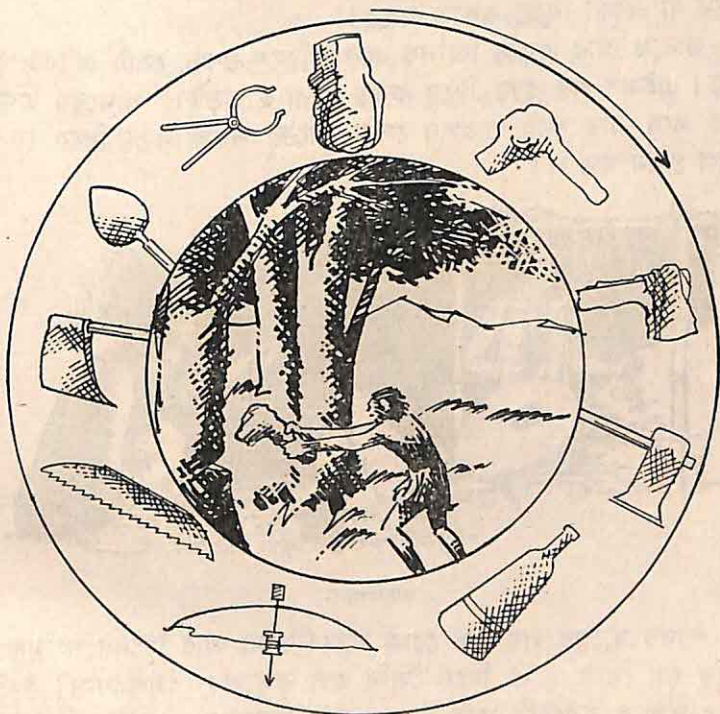
যন্ত্রপাতি পর পর কিভাবে এল

কাজে ব্যবহার করি। এগুলি আমরা এত সহজেই পাই যে, এসব আবিষ্কার করতে মানুষের যে কত সময় ও কত চেষ্টা লেগেছে, তা

একবার ভেবেও দেখি না।

আদিম কালের লোকেরা এসব কিছুই পায়নি। বনে বাঘ-ভালুকের সাথে তাদের বাস করতে হত। নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য হাতিয়ার যোগাড় করা ছিল তাদের সবচেয়ে বড় দরকার।

কিন্তু তখন তো কোন ধাতুই আবিষ্কার হয়নি। অস্ত্রশস্ত্র পাবে কোথায় তারা ? চারদিকে তারা দেখতে পেত পাথর। কাজেই দায়ে ঠেকে সেই পাথর ঘষে ধারালো করে তাই দিয়ে দা-কুড়ুলের কাজ চালাত। এসব তাদের চাই-ই। বাঘ-ভালুকের ধারালো নখ ও দাঁত আছে। তা দিয়ে তারা অনেক কিছু করতে পারে; কিন্তু মানুষের ওসব কিছুই নেই। কাজেই অস্ত্র বা হাতের কাজের যন্ত্র না পেলে তারা খুবই অসহায়। এসব পেলে তবেই তারা লড়তে পারে বা একটা কিছু করতে পারে।

মানুষ আর একটা জিনিষ বনে কুড়িয়ে পেত, সেটা জীবজন্তুর হাড়। এইসব শক্ত হাড় দিয়ে করত তারা হাতুড়ী। পাথরের একটা দিক ঘষে, ধার করে তারপর সেটা কাঠের সাথে লতা দিয়ে বেঁধে করল প্রথম কুড়ুল।
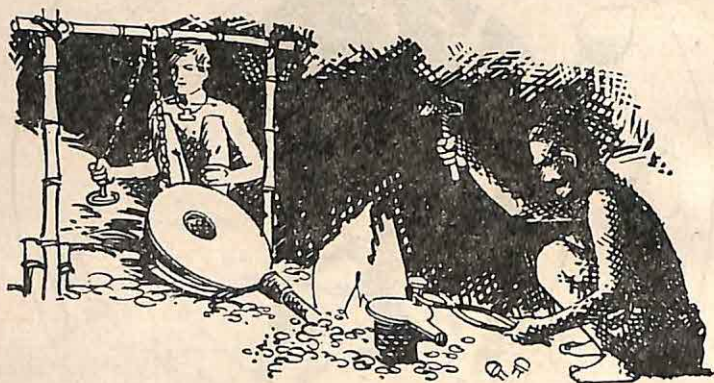
কামারশালা

পাথর যুগের পর এল ব্রোঞ্জ যুগ। তামা আর টিনের সংমিশ্রণে তৈরি হয় ব্রোঞ্জ। এ দিয়ে তৈরি হল কুড়ুল। মিশরবাসী তৈরি করল মুগুর, হাতুড়ী, কাঠ ছিদ্র করবার তুরপুণ। রোমের লোকেরা তৈরি করল করাত, বাইস।

ভারতের লোকেরাও আবিষ্কার করল নানারকম যন্ত্র, যা দিয়ে তারা অনেক কিছু তৈরি করতে পারল। মধ্যযুগে আবিষ্কার হল

কর্ণিক আর সাঁড়াশী। এ দু'টির কিন্তু বিশেষ পরিবর্তন হয়নি আজও। হাজার বছর ধরে কর্ণিক আর সাঁড়াশী প্রায় একই রকম আছে।

আজকাল নানারকমের রেঁদা আমরা ব্যবহার করি। প্রাচীনকালে এটা আবিষ্কার হয়েছিল হঠাৎ। একটি লোক তার পাথরের বাটালী-টাকে কি মনে করে আর একটা পাথরের মধ্যে ঢুকিয়ে ঘষা দিতেই তার কাঠটা পরিষ্কার হয়ে গেল! তার থেকেই এখনকার সব রেঁদার উৎপত্তি।

ক্রমে লৌহ যুগে পৌঁছাল মানুষ। এখন আর তাকে পায় কে? লোহা দিয়ে সে নানারকম অস্ত্র-শস্ত্র, কত নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করে ফেলল। এজন্য এই যুগটার নামই হল—যন্ত্রযুগ।

কিন্তু সেই আদিমকালের অনুপায়, অসহায় মানুষের কথা আমরা একবার ভেবে দেখতে পারি—কত অসুবিধার মধ্যে কাজ করে গিয়েছে তারা। আজ যে আমরা সহজেই এত যন্ত্রপাতি পাই, তার পথ দেখিয়ে গিয়েছে তারাই।

লেখাপড়া শেখা

আমরা লিখি এবং পড়ি। লেখা হচ্ছে মনের কথা আর কাউকে বলা, আর পড়া হচ্ছে আর কারও মনের কথা জানা।

বাপ্পা একটি ছোট ছেলের নাম। সে রাগ করেছে ভাত খাবে না। অনেকে সাধাসাধি করল, কিন্তু সে কিছুতেই খাবে না। সারাটা দিন সে না খেয়ে থাকল। অবশেষে সে আর থাকতে পারে না—ক্ষিধেয় পেট জ্বলে যায়। তখন সে একখানা কাগজে লিখল, আর একবার সাধলেই খাবো !

এটা তার মনের কথা। এই কথা সে জানিয়ে দিল বাড়ীর লোক-দের। বাড়ীর লোকেরা মুখ টিপে হাসল। তারপর তাকে খেতে দিল।

কোন কথা বলল না বাপ্পা, কিন্তু কাগজে যা লিখল, ওটাই তার মনের কথা। বাড়ীর লোকেরা সেই লেখাটা পড়ে তার মনের কথা জানল।

যারা লেখাপড়া জানে, তাদের কত সুবিধা। দূরে যারা আছে তাদের চিঠি দিয়ে তারা সব কথা জানাতে পারে। বই পড়ে তারা দেশ-বিদেশের কত কথা জানতে পারে। যা মনে থাকবে না তা লিখে রাখতে পারে। খবরের কাগজ পড়ে তারা দেশের কোথায় কি হচ্ছে সব খবর পায়।

এখনকার দিনে আমরা কত সহজে লেখাপড়া শিখতে পারি। কিন্তু আগেকার দিনে সে উপায় ছিল না। আমরা লিখি বা পড়ি ভাষার সাহায্যে। কারও ভাষা বাংলা, কারও হিন্দী, কারও ইংরাজী এই সব। ভাষা তৈরি হয় অক্ষর দিয়ে। আদিম যুগে অক্ষরই ছিল না!— লোকে ভাষা শিখবে কি দিয়ে ?

লেখাপড়া ছাড়াও আমরা যে কথা বলি, সেও তো ভাষা। মানুষ যখন গুহাবাসী ছিল, বনে বনে ঘুরে বেড়াত, তখন তাদের ভাষা ছিল না। তারা আমাদের মত কথা বলতেও পারত না। তারা বনের পশুর মত শব্দ করত। তারা কুকুরের মত ডাকত, ঝরণার জলের শব্দ শুনে সেই রকম শব্দ করত। একসঙ্গে কোনও ভারী জিনিষ তুলবার সময় তারা আপনা থেকেই 'হেইয়া হো' ধরনের শব্দ করত।

প্রথমে মানুষ আকারে ইঙ্গিতে মনের কথা জানাত। এখনও আমরা ক্ষিদে পেলে মুখে হাত দিয়ে দেখাই, রাগলে ঘুষি দেখাই, মুখ-ভেংচি দিই। অগ্রাহ্য করলে বুড়ো আঙুল দিয়ে কলা দেখাই। কিন্তু সব কথা তো আর হাত-মুখ নেড়ে বুঝানো যায় না! এজন্য এর পর মানুষ ছবি এঁকে মনের কথা জানাতো। ফুল জিনিষটি তারা ফুলের মতো একটা ছবি এঁকে বুঝাতো। হরিণ শিকার করতে যাচ্ছি—কথাটি তারা একটা হরিণ ছুটছে আর একটা মানুষ তার পিছু তীর-ধনুক নিয়ে ধাওয়া করেছে, এমনধারা একটা ছবি এঁকে জানাতো। সে আজ পাঁচ-ছয় হাজার বছর আগের কথা।

দেখা গেল এইভাবে ছবি আঁকতে সময় লাগে অনেক। তাছাড়া সবাই যে ছবি আঁকতে পারত তাও নয়। তখন ছবির বদলে তারা সংকেত ধরল। গোল একটা চিহ্ন এঁকে তারা বুঝাতো—যার শেষ নেই। এ-পথে যাবে না, বিপদ আছে—এ কথাটি তারা একটা গুণ চিহ্নের মত ছবি এঁকে সংকেতে জানাতো। যেদিকে যেতে হবে সেটা

শিলালিপি

দেখাত একটা তীর চিহ্ন দিয়ে। এইভাবে ছবিকে সহজ করতে গিয়ে তারা নানারকম সংকেত-চিহ্ন তৈরি করল। আজও আমরা রাস্তাঘাটে গাড়ী চালানোর ব্যাপারে বা আবহাওয়া বার্তায় অনেক সংকেত-চিহ্ন ব্যবহার করি।

এই সংকেত-চিহ্ন থেকেই এরপর কত শত বছর চেষ্টার পর আবিষ্কার হল অক্ষরের ব্যবহার। তারপর ভাষা আর তার উচ্চারণ।

অক্ষর তো আবিষ্কার হল, কিন্তু সে অক্ষর লিখবে কিসের উপর? না, কাগজের কথা তারা ভাবতেও পারেনি তখন।

তবে এমন একটা জিনিষের উপর তারা লিখত, যা আগুনে পুড়বে না, পোকাতেও কাটবে না!

সে জিনিষটা হচ্ছে—মাটির পাতলা টালী। কাঁচা মাটির টালীর উপর সরু কাঠি দিয়ে তারা লিখত। তারপর সেইসব টালী রোদ্দুরে শুকিয়ে ও আগুনে পুড়িয়ে নিত। এইভাবে একখানা বই করতে কত হাজার টালী লাগত একবার ভেবে দেখ!

হ্যাঁ, মাটি খুঁড়ে বহু যুগ আগের এমন একটা টালী-বইয়ের লাইব্রেরী পাওয়া গেছে। পরে তারা পাথরের গায়েও লিখত। একে বলা হত—শিলালিপি।

কোথাও কোথাও পাতলা তক্তার উপর মোমের আস্তরণ দিয়েও তার উপর সজারু কাঁটার সরু মুখ দিয়ে লেখা হত।

তারপর যখন তামা আবিষ্কার হল, তখন তামার পাতের উপর লোহার কাঁটা দিয়ে লেখা হত। একে বলা হত—তাম্রলিপি।

ছাগল-ভেড়ার চামড়ার উপরেও লেখার প্রচলন ছিল আগে। হিব্রু ভাষায় প্রাচীন বাইবেল বইখানি মেষের চামড়ার উপর লেখা হয়।

এরপর লোকের চোখ পড়ল—পাতার উপর। আমাদের দেশের কথাই বলছি। এখন আমরা বড় হতে না হতেই ফাউনটেন পেন দিয়ে কাগজের উপর লিখি। কিন্তু আগে সে উপায় ছিল না। আগে পাঁচ বছর বয়স হলে তবে 'হাতে খড়ি' দেওয়ার নিয়ম ছিল। তখন তালপাতার উপর বাঁশের কঞ্চি বা খাগের কলমে ভুসো কালি দিয়ে লিখতে হত। দোয়াত ছিল মাটির। এই দোয়াতের বাইরের দিকে তিনটি ছিদ্র থাকত। সেই ছিদ্রের মধ্যে দড়ি পরিয়ে শিকে করে দোয়াত বইত ছোট ছেলেরা। তাদের বগলে থাকত তালপাতার আঁটি। পাঠশালায় তারা তালপাতার আসনে বসত। কবি দীনবন্ধু মিত্র লিখেছেন—

তাড়ি বগলে ছেলের দলে
পাঠশালাতে যায়।

এরপর কলাপাতায় তাদের লিখতে হত ধারাপাত। শতকিয়া, কড়াকিয়া, পণকিয়া—এইসব।

অবশেষে ধরা হত কাগজ। লালচে রংয়ের বেলে কাগজ। সাদা কাগজ তখন খুব কমই পাওয়া যেত। ছেলে যেদিন প্রথম কাগজের উপর লিখবে, সে ছিল এক সমারোহ ব্যাপার!

আমাদের দেশে প্রথম তৈরি হয় তুলট কাগজ। তখন কোন বই তুলট কাগজ বা তালপাতার উপর লিখে নেওয়া হত। এইসব হাতে-লেখা বইয়ের নামই—পুঁথি।

তারপর বিদেশ থেকে আমদানি হল—কাগজ। কিন্তু কাগজ এলেই তো বই হয় না! হাতে লিখে ক'খানা বই নকল করা যায়?

তখনকার দিনে রাজহাঁসের পাখার পালকের গোড়ার দিকটা সরু করে কেটে কলম করা হত। এতে খুব ভালো লেখা চলত। তারপর আবিষ্কার হয়েছিল—নিব। কাঠের হাতলে সরু বা মোটা নিব পুরে নিয়ে লিখত অনেকেই।

কিন্তু লিখে লিখে মানুষ হয়রান হয়ে গেল। কাঁহাতক কত বই নকল করা যায়? তাই দরকারে পড়ে এরপর গড়ে উঠল ছাপাখানা। ছাপাখানার অক্ষরগুলি প্রথমে করা হয়েছিল কাঠ দিয়ে। কিন্তু কাঠ সহজেই খারাপ হয়ে যায়। তখন লোহার অক্ষর চালু হল। এটা করতে সময় লাগত অনেক, তাছাড়া কাজও খুব ভালো হত না। তখন অনেক চেষ্টার পর আবিষ্কার হল—সীসার অক্ষর। এখন এটাই চালু রয়েছে।

আগে হাত দিয়ে কাগজের উপর অক্ষরগুলির ছাপ মারা হত। এখন ছাপার যন্ত্র বিদ্যুতের সাহায্যে হাজার হাজার পাতা ছেপে ফেলতে পারে কয়েক মিনিটে।

নিবের বদলেও চালু হল ফাউনটেন পেন বা ঝরণা কলম।

তখন মেয়েরা পাঠশালায় কি ইস্কুলে যেত না। মেয়েদের লেখা-পড়া শেখার ব্যবস্থাও কিছু ছিল না। সমাজে ওটা চলত না। বাড়ীতে বসে মেয়েরা একটু-আধটু যে যা পারত শিখত। বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং আরও কয়েকজন সদাশয় লোক অনেক বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও মেয়ে-দের লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা করেন।

ভেবে দেখ, সেই আগেকার দিন এবং এখনকার দিন! তখন নানা দিক দিয়ে লেখাপড়া করার খুবই অসুবিধা ছিল। আর এখন তার তুলনায় আমাদের লেখাপড়া শেখার কতই না সুযোগ মিলেছে!

খবর পাঠানো

দূরে কাউকে খবর পাঠাতে হলে এখন আমরা ডাকে চিঠি লিখি। খবরটা খুব তাড়াতাড়ি পাঠাবার দরকার হলে আমরা টেলিগ্রাম করি।

কিন্তু আগে যখন ডাকঘর ছিল না, রেলগাড়ী ছিল না, টেলিগ্রাম আবিষ্কার হয়নি,—তখন লোকে খবর পাঠাতো কি করে?

খুবই অসুবিধা ছিল তখন খবর পাঠানো। তখন গাঁয়ের লোকের খবরাখবর করার একমাত্র জায়গা ছিল—হাট। দূর দূর গাঁ থেকে লোক আসত হাটে। তাদের জানাশোনা কারও কাছে খবর দিলে তারা আবার সে খবর সুবিধামত আর কারও কাছে দিয়ে দিত। এইভাবে লোক মারফত মুখে মুখে বা হাত-চিঠিতে খবর যেত। সে খবর পৌঁছাত খুব দেরিতে। তাছাড়া কোন গোপন খবর এভাবে পাঠানো চলত না।

রাজা-মহারাজরা খবর পাঠাতেন লোক দিয়ে। এই লোককে বলা হত দূত। দূত ঘোড়ায় চড়ে বা পায়ে হেঁটে অনেকদিন পরে পৌঁছাত যেখানে খবর দিতে হবে সেখানে।

পথঘাট তখন ছিল খারাপ। একটা ঘোড়া কত দিনই বা এক নাগাড়ে ছুটতে পারে?

এরপর চলতি হল—ঘোড়ার ডাক। পথের দূর দূর জায়গায় আলাদা আলাদা ঘোড়া রাখা হত। একটা ঘোড়ায় অনেকখানি পথ গিয়ে ঘোড়াটা পালটিয়ে নিত সওয়ার। দূরের খবর এইভাবে পাঠানো হত।

কিন্তু সাধারণ লোক এত ঘোড়া পাবে কোথায়? যাঁরা রাজা-বাদশা, বড় লোক, তাঁরাই এইভাবে খবর পাঠাতো। সাধারণ লোক এই কারণে দূর জায়গার লোকের সঙ্গে বড় একটা সম্বন্ধ রাখত না। নিজের গাঁয়ে বা আশপাশের গাঁয়ের লোকের সঙ্গে তাদের বিয়ে-থাওয়া, কাজকর্ম চলত।

তারপর ইংরেজ এল এদেশে। সরকারী কাজে খবর পাঠাতে হত তাদের নানা জায়গায়। ব্যবসায় হিসাবে তারা বাইরের সাধারণ লোকের

চিঠিও নিত। তখন ডাকঘর হয়নি। কোম্পানির লোকেরাই বাড়ী বাড়ী থেকে চিঠিপত্র যোগাড় করে নিয়ে যেত। সেজন্য পয়সা দিতে হত তাদের। এখন যেমন পোষ্টকার্ড আছে, খাম আছে, তখন তা ছিল না। কাজেই লোকের চিঠিরও কিছু ঠিক ছিল না,—কেউ দিত বড় চিঠি, কেউ ছোট। কারও চিঠি হত ভারী, কারও হালকা। আবার কোন্ চিঠি কত দূরে যাবে সেজন্য ভাড়ারও কম-বেশি হত।

এইসব নানারকম অসুবিধা দেখে সরকার তৈরি করল ডাক বিভাগ। তৈরি হল—ডাকঘর বা পোষ্ট অফিস। খাম, পোষ্টকার্ডের প্রচলন হল।
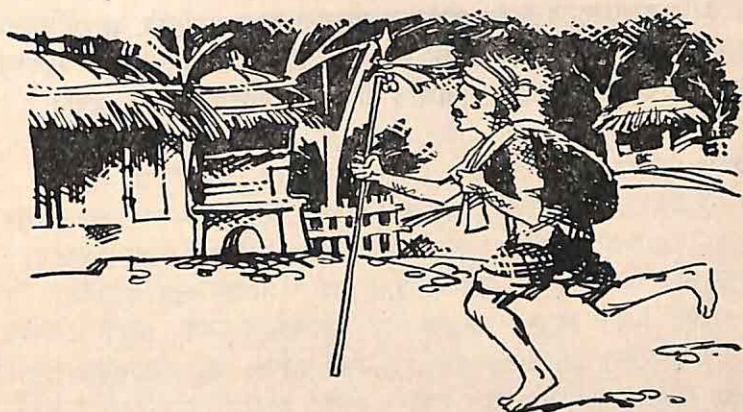
রাণার

এত কিছু হলেও ডাকঘরের ঐ সব চিঠির বোঝা নিয়ে ছুটতে হত কিন্তু মানুষকেই। তারা ছুটত এক গাঁ থেকে দূর দূর অন্য গাঁয়ে। তাদের যেতে হত এক ডাকঘর থেকে অন্য ডাকঘরে। এদের বলা হত—ডাক-হরকরা বা রাণার। মোটা কাপড়ের থোলের ভিতরে চিঠিপত্র ঢুকিয়ে ঐ থোলের মুখ দড়ি দিয়ে বেঁধে তার উপর গালা দিয়ে ডাকঘরের ছাপ মেরে দেওয়া হত। রাণারের হাতে থাকত বাঁশের মোটা লাঠির মাথায় একটা বল্লম। সেই সঙ্গে একটা ঘুঙুর বা ঝুনঝুনি বাঁধা থাকত। থোলেটাকে সেই লাঠির মাথায় ঢুকিয়ে নিয়ে ছুটত রাণার। ঝুন্ ঝুন্ করে শব্দ হত তার চলার সময়। হাতে একটা হারিকেন নিয়ে ছুটত সে রাতের বেলায়। লোকে পথ ছেড়ে দিত—সরকারী ডাক যাচ্ছে দেখে। পথে ঝড় হোক, বৃষ্টি

হোক্, তাতে সে থামবে না। লোকের কত সব দরকারী খবর ঘাড়ে করে সে ছুটছে। তার কাজে একটু এদিক-ওদিক হলে সব গোলমাল হয়ে যাবে। রাণার ছুটে চলে, গা দিয়ে তার দরদর ধারায় বেয়ে পড়ে ঘাম।

এখন রেলগাড়ী হয়েছে, বাস হয়েছে। এইসব গাড়ীতেই এখন ডাক যায়। উড়ো-জাহাজেও অনেক দূরের ডাক নেওয়া হয়। যেসব গাঁয়ে বাস চলে না, এখনও এমন কোন কোন দু'একটি ডাকঘর থেকে ডাক-হরকরা চিঠিপত্র নিয়ে অপর ডাকঘরে দিয়ে আসে বটে, কিন্তু আগের মত এখন আর তাদের বিপদ মাথায় করে দূর দূর পথ ছুটতে হয় না।

আজকাল দূরে খবর পাঠানো অনেক সহজ। চিঠি বা টেলিগ্রাম এখন ভারতের মধ্যে যে কোন জায়গায় একই খরচায় যায়। তাছাড়া দূরের কারও সঙ্গে এখন সরাসরি টেলিফোনে কথা বলাও চলে।

দেশ-বিদেশে যাওয়া

এখন আমরা হাজার মাইল পথ রেলগাড়ীতে দশ-বারো ঘন্টায় যাই। উড়ো-জাহাজে গেলে আরও অনেক কম সময়ে যাওয়া যায়। হিল্লী-দিল্লী এখন আর দূর বলে মনে হয় না আমাদের।

কিন্তু আগেকার লোকের দূর দূর পথ যাওয়া খুব সহজ ছিল না। তখন যারা কাশী, গয়া কি পুরী যেত, তারা বাড়ীর লোক এবং পাড়াপড়শীদের কাছ থেকে একরকম শেষ বিদায় নিয়েই যেত। তাদের নৌকা বা হাঁটাপথেই চলতে হত। দেড় মাস, দু' মাস পরে তারা ঐ সব জায়গায় গিয়ে পৌঁছাত। সকলেই যে পৌঁছাত তা নয়—কেউ ফিরে আসত, কেউ বা মারা পড়ত পথেই।

গরুর গাড়ী তখন ছিল; কিন্তু গরুর গাড়ী করে তো দূর পাল্লার পথ যাওয়া যায় না! মেয়েছেলেরা তখন এক গাঁ থেকে অন্য গাঁয়ে গরুর গাড়ীতেই যেত। অনেক সময় লাগত গরুর গাড়ীতে যেতে।

নৌকাও ছিল তখন। কম দূরের পথ 'টাবুরে' নৌকায় যাওয়া চলত। এখন যেমন রেলগাড়ী কি বাস-এ সকলে ভাড়া দিয়ে ওঠে এবং একসঙ্গে যায়, তখন তেমনি উঠত—'গহনার নৌকায়'। এই নৌকায় একসঙ্গে অনেক লোক যেত। যে যেখানে নামতে চাইত, হিসাব মত ভাড়া দিয়ে সেখানে সে নামতে পারত।

বড় বড় লোকেরা চড়ত—'বজরায়'। খুব তাড়াতাড়ি কোথাও যেতে হলে নদীপথে চলত 'ছিপ'। তখন বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত পালতোলা বড় বড় নৌকায়।

রাজা-মহারাজারা তখন চলতেন হাতীতে। ঘোড়ার গাড়ীতেও পথ ভালো থাকলে কেউ কেউ ধারেকাছে যাতায়াত করতেন। কিন্তু এর সবগুলিতেই সময় লাগত অনেক।

কী অসুবিধাই তখন ছিল দেশে-বিদেশে দূরের পথ যাওয়া!

উনানে ভাতের হাঁড়ি চড়ালে তার মুখের সরাটা কেমন ওঠা-নামা করে আমরা দেখেছি। জেমস্ ওয়াট নামে একটি ছেলে দেখল, চায়ের কেটলিতে জল ফুটছে ফোঁস্ ফোঁস্ করে। ঢাকনিটা একবার উঠছে, একবার নামছে। ওয়াট একটা চামচে দিয়ে ঢাকনিটাকে চেপে রাখতে গেলেন। দেখলেন, কী জোর ঐ ঢাকনিটার! কিসে যেন নিচে থেকে

ঠেলা মেরে ওটাকে উপরে তুলতে চাইছে!

কেন এমন হয়? কিসে এই ঠেলা দেয়? ওয়াটের মাথায় এই ভাবনা ঢুকে গেল। বড় হয়ে তিনি আবিষ্কার করলেন বাষ্পশক্তি। তিনি দেখলেন, জল খুব গরম করলে তার থেকে বাষ্প হয়। এই বাষ্প দিয়ে অনেক কাজ করা যায়। এরপর তিনি তৈরি করলেন এঞ্জিন। বাষ্পশক্তি দিয়ে তিনি এঞ্জিন চালালেন।

একতলা ঘর না হলে তার উপর দোতলা ঘর হয় না। কোনও একটা ছোট আবিষ্কারের উপর ভর করে বড় বড় আবিষ্কার হয়। ওয়াটের ওই আবিষ্কারটি পেয়ে তার উপর আরও অনেকে মাথা খাটালেন। তার ফলে আমরা পেলাম রেলগাড়ী আর ষ্টীমার। দুটোই বাষ্পশক্তিতে চলে। দূর পথ আমাদের কাছে নিকট হয়ে গেল।

রেলগাড়ীকে আগে আমাদের দেশের লোকেরা 'কলের গাড়ী' বলত। তখনকার লোকেরা জানত, কোনও গাড়ীকে ঘোড়া বা গরুতে টানে। কেউ না টানলে গাড়ী চলবে কি করে? তাই যখন আমাদের দেশে প্রথম রেলগাড়ী চলল, তখন লোকে খুবই অবাক হয়ে গেল।

আমাদের বাংলাদেশে প্রথম রেলগাড়ী চলে ১৮৫৪ সালে। সে অনেক দিন আগের কথা। এই গাড়ী চলেছিল হাওড়া থেকে হুগলী অবধি। এর আগে এইরকম গাড়ীর বিষয়ে লোকের কিছুই ধারণা ছিল না। তারা মনে করল, ওই এঞ্জিনটার ভিতরে একটা দেবতা-টেবতা কেউ আছেন। তা না হলে এত জোরে ওটাকে চালায় কে?

তখন এই রেলগাড়ী দেখতে লোকে পনের-কুড়ি মাইল দূর থেকে রেল লাইনের কাছে এসে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকত! দূর থেকে এঞ্জিনটাকে দেখে কেউ গলায় কাপড় দিয়ে, মাথা নীচু করে প্রণাম করত, আবার কেউ বা হাত জোড় করে মাপ চাইত দেবতার কাছে!

তখন দূর থেকে ছোট ছেলেরা এই গাড়ী দেখে নাচত আর বলত :

'ধায় গাড়ী ধূম ছাড়ি
ধায় শত পায়
ঝড় গতি জোর অতি
দুনিয়া কাঁপায়!
উঁকি মেরে ঝাৎ করে
সরে যায় সাৎ করে
দেখি ঘাড় কাৎ করে—নাই, আর নাই!
ধায় গাড়ী ছোটে বাই বাই।'

রেলগাড়ীর পর এল মোটর গাড়ী। রেলগাড়ীর এঞ্জিন দেখে ওদেশের লোকেরাও ওটাকে একটা ভূতুড়ে ব্যাপার মনে করেছিল। ঐ গাড়ীতে গরু-বাছুর ও মানুষ কাটা পড়বে—এই ভয়ে তখন গাড়ীর আগে আগে লোক ছুটত একটা লাল নিশান হাতে করে। তারা সকলকে সাবধান করে দিত।
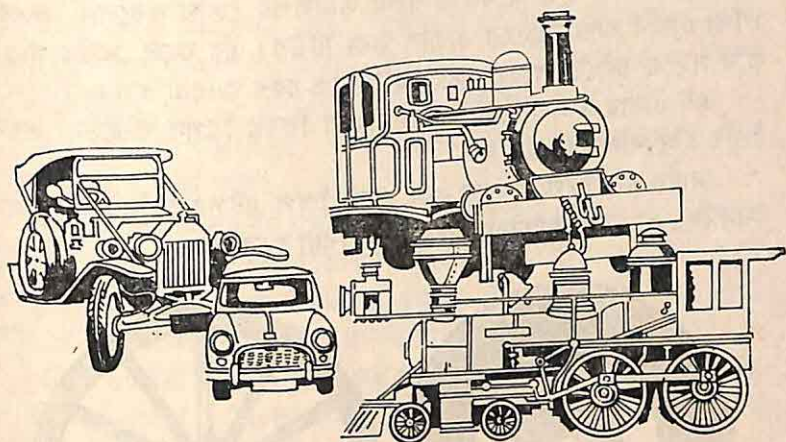
মোটরগাড়ী ও রেলগাড়ীর বিবর্তন

মোটর গাড়ীর বেলায় আর তত ভয় থাকল না লোকের। কিন্তু প্রথম দিকে যে মোটর গাড়ী তৈরি হয়েছিল, তা দেখে লোকে হেসে-ছিল খুব। সে গাড়ী না ছিল আরামের, না ছিল দেখতে ভালো।

প্রায় একশো বছর আগে একজন জার্মান একখানি তিন চাকার মোটর গাড়ী তৈরি করেন। এইসব গাড়ী ঘন্টায় আট-দশ মাইলের বেশি চলত না। আগে মোটর গাড়ীকে রেলগাড়ীর মত বাষ্প দিয়ে চালানো হত। তারপর এল পেট্রোল। এখন বিদ্যুতের সাহায্যে রেলগাড়ী চলে।

সাইকেল, মোটর গাড়ী, বাস—এ সবই চলে চাকায়। সে চাকা তৈরি হয় রবার দিয়ে। ঠাণ্ডায় রবার ঠিক থাকে কিন্তু গরমে রবার যায় গ'লে। গরম ও ঠাণ্ডা উভয় ঋতুতেই রবারকে সমান কাজে লাগানো একদিনে সম্ভব হয়নি। একদিন গুডইয়ার নামে এক সাহেব এটা-ওটা নানারকম চেষ্টার পর রবারের আঠার সঙ্গে গন্ধক মিশিয়ে দেখছিলেন কি হয়। হঠাৎ ঐ রবারটা পড়ল গিয়ে গরম ষ্টোভের উপর। তিনি তাড়াতাড়ি ওটা তুলে নিলেন। রবারটা ঠাণ্ডা হলে

দেখা গেল, ওটা বেশ শক্ত হয়ে গেছে, গরমে গলে যায়নি! যা তিনি চেষ্টা করছিলেন কতদিন ধরে, তাই তিনি এইভাবে হঠাৎ পেয়ে গেলেন।

প্রথম দিকে মোটর গাড়ীর 'টায়ার' নিরেট রবার দিয়ে তৈরি হত। তার ভিতর কোন ফাঁক থাকত না। ওটা জোরে চলতে পারত না মোটেই, ভারীও হত খুব। তারপর ডানলপই তৈরি করলেন ভিতর-ফাঁপা টায়ার আর ভিতরে বাতাস-ভরা টিউব। এর ফলে মোটর গাড়ী খুব সহজে চলতে পারল, আরোহীদেরও বেশ আরাম হল।

এই টায়ার জলকাদায় পিছলে গিয়ে কিন্তু বিপদ ঘটাতো। তখন তৈরি হল খাঁজকাটা টায়ার।

মোটর গাড়ী থেকে পরে বাস, লরী, জিপ এইসব তৈরি হল। এখন আমাদের দূর পথ যাতায়াতের কত সুবিধা হয়েছে!
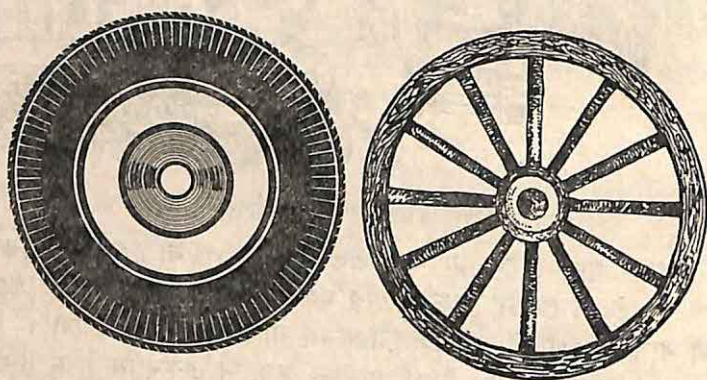
আকাশে উড়া

গরুর গাড়ী থেকে ঘোড়ার গাড়ী। তারপর রেলগাড়ী, মোটর গাড়ীতে চলেও মানুষের আশা মিটল না। পাখী আকাশে ওড়ে। মানুষেরও বহুকাল থেকে সাধ,—পাখীর মত আকাশে উড়বে! কিন্তু কেমন করে তা হবে?—মানুষের তো পাখীর মত ডানা নেই।

তবু মানুষ থামল না। নানারকমে মানুষ দেখতে লাগল—কি করে আকাশে উড়া যায়।

গরম ধোঁয়া বাতাসের চেয়ে হালকা। ফরাসী দেশের দুটি ছেলে একদিন কাগজের বড় থলে তৈরি করে তার ভিতর গরম ধোঁয়া পুরে ছেড়ে দিল। ওটা আকাশে উঠল, কিন্তু যেই ধোঁয়াটার গরম কমে গেল, অমনি থলেটা নেমে এল মাটিতে।

এরপর ধোঁয়াটা যাতে গরম থাকে, সেজন্য কাগজের ঐ বেলুনটার নিচে আগুন রেখে দেওয়া হল। বেলুনটা এবার অনেক দূর উড়ে গেল।

আবার বেলুন উড়ানো হল। এবার খালি বেলুন নয়, ওর সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হল একটা ঝুড়ি। তার ভিতর থাকল একটা ছাগল, একটা মুরগী আর একটা হাঁস। বেলুনটা আকাশের অনেক উপরে উঠে ধীরে ধীরে নেমে এল।

এতে লোকে সাহস পেল। একজন বেলুনে চেপে যেতে চাইল উপরে। বেলুনের সঙ্গে ঘুড়ির সুতোর মত করে একটা দড়ি বেঁধে তাকে তুলে দেওয়া হল। বেলুনটা লোকটিকে নিয়ে ধীরে ধীরে আকাশে উঠে গেল। কয়েকশো ফুট উপরে উঠবার পর দড়িটি টেনে বেলুনটাকে নামিয়ে আনা হল।

এবার সাহস আরও বেড়ে গেল মানুষের। এরপর ঐ লোকটি আর একজনকে সঙ্গে নিয়ে উপরে উঠল। তারা পাঁচ-ছ'শো ফুট উপরে উঠে নিরাপদে নেমে এল।

কিন্তু দেখা গেল, গরম ধোঁয়া পুরে বেলুন উড়াবার অসুবিধা অনেক। আবিষ্কার হল—হাইড্রোজেন গ্যাস। লোকেরা দেখল, বেলুনে এই গ্যাস ব্যবহার করাই সুবিধা।

ফরাসী দেশে একবার একটা খুব বড় বেলুন তৈরি করে তাতে হাইড্রোজেন গ্যাস পুরে আকাশে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। আকাশে বহু উপরে উঠে ওটা কোথায় গেল কেউ তা বুঝতে পারল না।

ওটা কিন্তু পড়েছিল গিয়ে এক মাঠে। গাঁয়ের লোক ওটাকে দেখে ভয়েই জড়সড়!

খবরটা রটে গেল চারদিকে। তারা ভাবল, ওটা একটা ভয়ানক জানোয়ার। সাহসী যারা, তারা দলবল নিয়ে ছুটে এল—হাতে তাদের লাঠি, সড়কি আর বর্শা। জানোয়ারটিকে চারধার থেকে ঘিরে ফেলে তারা যে যা পেল—ইঁটপাটকেল ছুঁড়ে, লাঠি মেরে, বর্শা বিঁধিয়ে তাকে ঘায়েল করে ফেলল। কাছে গিয়ে পরে তারা দেখতে পেল, আসলে ওটা কোন জীবই নয়,—একটা কাগজের বড় বেলুন!

হাইড্রোজেন গ্যাস দিয়ে বেলুন তৈরির অসুবিধা ছিল এই যে, ওটা উপরে উঠলে বাতাসের গতি অনুসারে চলত। খুশী মত বেলুনটাকে চালানো যেত না।
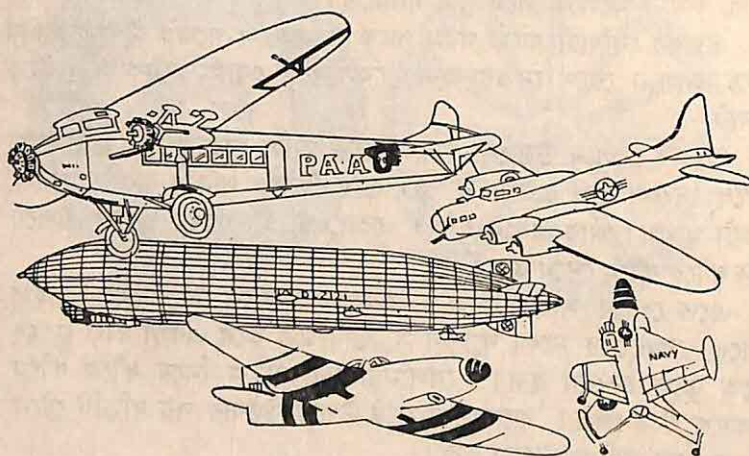
নানা ধরনের বিমান

জার্মান দেশের জেপলিন সাহেব একখানি উড়ো-জাহাজ তৈরি করলেন। এর সঙ্গে থাকল একটা এঞ্জিন। তাতে খুশীমত উড়ো-জাহাজটিকে এদিক-ওদিক চালানো যেত। ওটা চলত কিন্তু হাইড্রোজেন গ্যাসেই। ঐ গ্যাসটা সহজেই জ্বলে ওঠে। তাই ওর এঞ্জিনটাকে রাখা হত গ্যাস থেকে দূরে। এই অসুবিধার জন্য এরপর

থেকে হাইড্রোজেনের বদলে—হিলিয়াম গ্যাস ব্যবহার করা হত। এই গ্যাস জ্বলে ওঠে না। জেপলিন সাহেবের নাম অনুসারে এই বিমানের নাম হল জেপলিন।

গ্যাস ছাড়া কি করে আকাশে উড়া যায় এ নিয়ে ভাবছিলেন অনেকেই। আজ থেকে প্রায় ষাট বছর আগে আমেরিকার রাইট ব্রাদার্স নতুন ধরনের একটা যন্ত্র তৈরি করলেন। এর নাম গ্লাইডার। বেলুন বা জেপলিনে গ্যাস ভর্তি করে ওটাকে করে ফেলা হত বাতাসের চেয়েও হালকা। কিন্তু এই গ্লাইডার বাতাসের চেয়ে অনেক ভারী। এটা চালাবার সময় ওদের দু' ভাইয়ের একজন পড়ে গিয়ে তার দেহের কয়েকখানি হাড় চুরমার হয়ে গিয়েছিল। তবু তাঁরা থামেননি। যন্ত্র তৈরির কাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা এরপরও।

তারপর বাধল একটা মহাযুদ্ধ। এই যুদ্ধে আকাশে উড়ার তাগিদে নানা কৌশলে তৈরি হল—এরোপ্লেন।

এখন এরোপ্লেন, হেলিকপটার, বোমারু, জেট—কত রকম বিমান তৈরি হয়েছে। এগুলিতে আজকাল হাজার হাজার মাইল আকাশ-পথে উড়ে যাওয়া যায় অতি কম সময়ে।

ফটো তোলা ও সিনেমা দেখা

'রেডি'—তারপরই টুক করে টিপে দেওয়া হল ক্যামেরার সাটারটা। ব্যস, অমনি ফটো উঠে গেল!

এক মিনিটের ব্যাপার।

কিন্তু এটা আবিষ্কার করতে আগেকার দিনে লোকের বছরের পর বছর কেটে গেছে।

ফটো জিনিষটা কোন কিছুর ছায়ার ছবি। মাটির দেওয়াল বা পাকা ঘরের সব জানালা দরজা বন্ধ কর। ঘরটার পূব দিকটা খোলা হওয়া চাই। ঐ ঘরের পূব দিকের দরজা বা জানালায় একটা ছোট ছিদ্র করে নাও। ঘরের ভিতর একটা সাদা মশারি বা সাদা কাপড় টানাও। ঘরের পূব দিকের ফাঁকা জায়গায় যদি একটা নারকেল গাছ কি পেঁপে গাছ থাকে, তা'হলে ভোরবেলায় দেখবে, সাদা কাপড়ের উপর তার ছবি পড়েছে। এটা সূর্য উঠবার সময়ে হবে। সূর্য না থাকলে বা বেলা বেড়ে গেলে হবে না। আবার তুমি যদি ঐ সময়ে ঘরের দরজা-জানালা খুলে আলো আসতে দাও, তা হলেও কাপড়ের গায়ে গাছের ছবিটা দেখতে পাবে না।

ফটো তোলার আসল ব্যাপারটা এই।

এ নিয়ে ভাবতে হয়েছে অনেকদিন। ঘরটাকে ধরা হল ক্যামেরা। কিন্তু সাদা কাপড়ে যে ছায়াটা পড়ে, ওটা আবছা মত। কাজেই যেখান দিয়ে আলোটা এল, সেখানটা আরও জোরদার করা দরকার। অনেক চেষ্টার পর আবিষ্কার হল—লেন্‌স। তারপর ঐ সাদা কাপড়ের কথা। ওর উপর ছায়াটাই পড়ে, ছায়ার দাগ পড়ে না।

অনেকে ভাবতে লাগলেন, কি করে ঐ সাদা কাপড়ের বদলে এমন কিছু রাখা যায়, যাতে ছবিটার দাগ পড়ে তার উপর এবং দাগটা ধরে রেখে দরকার মত কাজে লাগানো যায়।

ডেভি নামে একজন আবিষ্কার করলেন, একরকম রাসায়নিক জিনিষের উপর সাদা কাগজ ডুবিয়ে নিয়ে তার উপর কোন কিছুর ছায়া ফেললে, ছায়ার দাগ কাগজখানির উপর পড়ে; কিন্তু পরে দেখা গেল, ঐ দাগ কাগজখানির উপর বেশি সময় থাকে না।

তারপর নিপস্‌ নামে আর একজন আর একরকম রাসায়নিক দিয়ে ছবির দাগটাকে অনেক দিন রাখতে পারলেন।

এসব প্রায় একশো বছর আগের কথা।

তারপর আবিষ্কার হল—কাঁচের প্লেট ও পরে সেলুলয়েডের ফিল্‌ম।

এগুলিও একরকম রাসায়নিক দিয়ে তৈরি। একটু আলোতেই এর উপর কোন কিছুর ছায়ার দাগ পড়ে। যার ফটো তোলা হবে, তাকে রাখতে হবে ক্যামেরার সামনে। তারপর লেন্‌স্‌-এর সাহায্যে তার ছবিটা ঐ কাঁচের বা ফিল্‌ম-এর উপর ফেলা হয়। লেন্‌স-এর সামনে থাকে একটা সাটার। সেটাকে খুলতেই ছিদ্রপথে আলো গিয়ে ঐ প্লেট বা ফিল্‌ম-এর উপর পড়ে। তারপরই সাটারটা ছেড়ে দিলে ক্যামেরার ভিতর আর আলো পড়তে পারে না।

এভাবে যে ছবিটা উঠল, তাকে বলে নেগেটিভ। ওটাকে একটা আঁধার ঘরে নিয়ে একরকম লাল আলোর সামনে রাখা হয়। সাদা আলো পড়লে কিন্তু ছবিটা কালো হয়ে খারাপ হয়ে যায়। লাল আলোয় তা হয় না। তারপর একটা রাসায়নিকের ভিতর ঐ প্লেট বা ফিল্‌মটা ডুবানো হয়। এরপর আর একটা রাসায়নিক দিয়ে প্লেট বা ফিল্‌মটা ধুয়ে ফেলতে হবে। এখন ছবিটা আলোতে আনলে খারাপ হবে না।

এইবার একরকম বিশেষ কাগজ ঐ নেগেটিভের উপর রেখে চাপ দিলে আসল ফটোটা পাওয়া যায়। এরপর ছবিটা শুকিয়ে নিতে হয়।

আজকাল নানারকম রঙিন ফটো তোলা যায়। যে জিনিষের যা রং ফটোতে তা ধরা পড়ে। চলন্ত কিছুর ছবিও তোলা যায়। সেজন্য আলাদা আলাদা ক্যামেরা আছে। কত সহজেই না এসব হয় এখন!

সিনেমা:

সিনেমায় আমরা যা দেখি, সেও ফটো। তবে ফটোতে আমরা যে সব ছবি দেখি, সে কেবল ছবিই। সে ছবি এক জায়গায় কাগজের উপর থাকে। কিন্তু সিনেমার ছবি ছুটাছুটি করে, লাফ-ঝাঁপ মারে, গান গায়—এসব দেখা যায় কি করে?

আমরা ছেলেবেলায় একরকম ফুলঝুরি বাজি করতাম। তাতে খরচ ছিল না এক পয়সাও। শীতকালে খেজুর গাছ কাটে। তখন খেজুর গাছের শুক্‌নো বাকল পাওয়া যায়। ঐ বাকলে আগুন দিলে ছাই হয়। এই সময়ে একটা মানকচুর পাতা ঝাঁটার কাঠি দিয়ে ফুটো ফুটো করা হত। ঐ ছাই আগুন থাকতে থাকতে পাতাটায় জড়িয়ে

তাতে দড়ি বেঁধে মাথার উপর ঘুরানো হত। তখন অজস্র ফুল্কি বেরোত ঐ পাতা থেকে। মনে হত, মাথার উপর একটা গোলাকার ফুলঝুরি ঘুরছে। এরকম হওয়ার কারণ, ফুলকিগুলি এত তাড়াতাড়ি পড়ে যে, তাতে মনে হয়, একটা ফুলঝুরির মালাই বুঝি মাথার উপর গোলাকার হয়ে ঘুরছে!

সিনেমার ছবির ব্যাপারটাও মূলে এই।

প্রায় একশো বছর আগে ফরাসী দেশে একজন একটা নতুন ধরনের খেলনা তৈরি করেছিলেন। একগাছি সুতো ও একখানা তাস নিয়ে এই খেলনা দেখানো হত। তাসখানির এক পিঠে আঁকা থাকত একটা ঘোড়ার ছবি, আর এক পিঠে থাকত একটা মানুষের ছবি। সুতোটায় বেশ করে পাক দিয়ে হঠাৎ ছেড়ে দিলে তাসখানি বেশ জোরে জোরে ঘুরত। তখন ঐ তাসের দুই পিঠে আঁকা ছবি দুটি যেন একদিকে এসেছে বলে মনে হত। আর দেখা যেত, মানুষটি ঘোড়ার পিঠে উঠে ছুটছে!
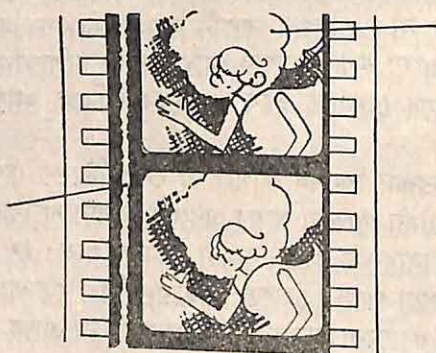
খাঁজ-কাটা জায়গায় থাকে শোনবার কথা আর মাঝে থাকে দেখবার ছবি

এরপর থেকে এই ধরনের অনেক ছবি বেরল। তৈরি হল ম্যাজিক লণ্ঠন। এডিসন সাহেব একরকম যন্ত্র তৈরি করলেন, যার হাতল ঘুরালেই কতকগুলি ছোটো ছোটো ফটো পর পর এমন তাড়াতাড়ি চলত যে, সব ছবিগুলি মিলে একটা চলমান ছবি তৈরি হয়ে যেত।

আজকালকার সিনেমার ছবিগুলিও এইভাবে দেখান হয়। গোড়ার দিকে সিনেমার ছবিতে কেবল ঘোড়দৌড়, মোটর গাড়ীর ছুটাছুটি এইসব দেখান হত। যাট বছর আগেও সিনেমায় কোন নাটকের অভিনয়

দেখান যায়নি। এরপর দেখান গেল—নাটকের মূক অভিনয়। এই নাটকের লোকেরা কোন কথা বলত না,—হাতমুখ নেড়ে মনের ভাব জানিয়ে যেত।

ইতিমধ্যে আবিষ্কার হল বিদ্যুতের শক্তি। এই শক্তি দিয়ে মানুষ অনেক কাজ করতে পারল। অমনি চারদিকে আবিষ্কারের হিড়িক পড়ে গেল। সিনেমার ছবির কথা শুনাবার জন্য তৈরি হল ফটো-সেল। বিদ্যুতের সাহায্যে কথা আর গানের ছবিও তোলা গেল। তখন মূক অভিনয়ের সঙ্গে কথা আর গানের শব্দ জুড়ে দেওয়া হল। একটা সিনেমার ফিল্‌ম দেখলেই বুঝা যাবে, ওর মাঝখানটায় থাকে দেখবার ছবি আর পাশে খাঁজ-কাটা জায়গায় থাকে শোনবার কথা।

এখন আমরা সিনেমায় দেশ-বিদেশের ছবি, অভিনয়, রঙিন ছবি, গান—কত কি কত সহজেই পাই; কিন্তু আগে এগুলির কথা লোকে ভাবতেও পারেনি।

চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার

আগেকার লোকে অসুখ-বিসুখে কত কষ্টই না পেয়েছে! তখন রোগটা কি, সহসা ধরা যেত না। ধরা গেলেও তার ঠিক ঠিক ওষুধ পাওয়া সহজ ছিল না।

তখন কবিরাজী বা হেকিমী চিকিৎসার চলন ছিল। এখনকার মত চিকিৎসাবিদ্যা শিখবার সুযোগ ছিল না তখন। তাই অনেক রোগী হাতুড়ে চিকিৎসকের হাতে মারা যেত। গাছপালা, লতাপাতা, মাটি, জল এইসব দিয়েই তখন বেশির ভাগ চিকিৎসা হত। তা' ছাড়া ঝাড়ফুঁক, তন্ত্র-মন্ত্রও ছিল। লোকে মনে করত, অসুখ-বিসুখ, রোগ, শোক—এসব কোন দেবতার রাগের ফল। তাই কোন রোগ হলে অনেকে দেবতার পূজো করে তাবিজ-কবচ ধারণ করত।

তখন রোগ ছিল, কিন্তু কোন চিকিৎসা ছিল না তার। ম্যালেরিয়া হলে খুব কাঁপিয়ে জ্বর আসত, পিপাসা হত, তারপর হাত-পা অবশ হয়ে রোগী মারা যেত। বাংলার কত গ্রাম উজাড় হয়ে গিয়েছে এই ম্যালেরিয়ায়। একজন দুজন নয়,—হাজার হাজার মানুষ মারা গিয়েছে অকালে এই ম্যালেরিয়ায়। কালাজ্বরেও যে কত লোক মারা গিয়েছে তার ঠিক নেই। কালাজ্বরে রোগীর চেহারা দেখলে আঁতকে উঠতে হত। তার হাত-পা হয়ে যেত সরু সরু, পেটটি হত খুব মোটা। খুব ফরসা মানুষেরও গায়ের রং হয়ে যেত—কালো ঝুল!

লোকে তখন জানত না,—কিসের থেকে কিভাবে রোগ ছড়ায়। পরে আবিষ্কার হল অণুবীক্ষণ যন্ত্র। এই যন্ত্রে আমরা খালি চোখে যা দেখতে পাই না, তা দেখা যায়। এতে ধরা পড়ল,—রোগীর রক্তে, মলমূত্রে, ময়লা জলে, থুথু-কাশিতে নানা ধরনের রোগ-জীবাণু কিলবিল করছে।

এরপর ঐ রোগ-জীবাণুগুলিকে কিভাবে মারা যায় তার চেষ্টা চলল দিনরাত। ম্যালেরিয়া জ্বরে আবিষ্কার হল—কুইনিন। কালাজ্বরে আবিষ্কার হল—ইনজেকসন। অনেক চেষ্টার পর ম্যালেরিয়া আর কালাজ্বর এখন দেশছাড়া হয়েছে।

আগে কলেরা আর বসন্ত রোগ ছড়িয়ে পড়লে তাতে অনেক

লোকের প্রাণ যেত। এই রোগ কেন ছড়িয়ে পড়ে লোকে তা' জানত না, চিকিৎসাও ঠিক হত না। কেন রোগ হয় তা না জানলে চিকিৎসা হবেই বা কি করে! অণুবীক্ষণে ধরা পড়ল, কমার মত দেখতে এক-রকম জীবাণু কলেরা রোগের কারণ। জল আর খাদ্যের সঙ্গে এই জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে। তারপর কলেরা চিকিৎসা, ইনজেকসন ও টিকা আবিষ্কার হল।

বসন্ত রোগও বাতাসে ছড়ায়। একজন বিজ্ঞানী দেখলেন, এক-বার কারও বসন্ত রোগ হলে সে যদি বেঁচে যায়, তা হলে তার আর বসন্ত রোগ হয় না এবং হলেও সেটা খুব মারাত্মক হয় না। এর কারণ কি? অনেক রকম পরীক্ষা করে তিনি বুঝলেন, ঐ রোগ শরীরে এমন কতকগুলি পদার্থ তৈরি করে, যারা পরে বসন্তরোগের অন্য জীবাণুকে শরীরে ঢুকতে দেয় না। তিনি তখন গরুর গায়ের বসন্ত থেকে বীজ নিয়ে মানুষের গায়ে দিয়ে টিকার চলন করলেন। এই বিজ্ঞানীর নাম জেনার। তিনি আজ সারা জগতের কাছে তাঁর এই টিকা আবিষ্কারের জন্য ধন্য হয়ে আছেন। বসন্ত রোগ এখন আর মহামারীরূপে দেখা দিতে পারে না।

আগে থার্মোমিটার ছিল না। কোনও অসুখের প্রকোপটা কত-খানি তা' জানিয়ে দেয় জ্বরে। জ্বরের উঠা-নামা ধরা পড়ে এই থার্মোমিটার যন্ত্রে। এখন থার্মোমিটার আবিষ্কার হওয়াতে চিকিৎসার খুবই সুবিধা হয়েছে।

বুকে-পিঠে সর্দি বসলে আগে সেটা অনুমান করে চিকিৎসা করা হত। এখন ষ্টেথোস্কোপ আবিষ্কার হওয়ায় এটা দিয়ে রোগীর বুকের রকমারি আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়। চিকিৎসকদের এই যন্ত্রটা খুবই দরকার। তাই এটা সব সময় তাঁদের সঙ্গেই থাকে। এর সাহায্যে রোগীর বুক-পিঠ কেমন আছে বেশ সহজেই জানা যায়।

ইনজেকসন দেবার পিচকিরিতে চাপ দিলে ওর মুখে লাগানো ফাঁপা সূঁচের ভিতর দিয়ে রোগীর দেহে ওষুধটা ঢুকে যায়। অনেক সময় রোগীর মুখ দিয়ে ওষুধ খাওয়ালে তার ফল হতে বেশ সময় লাগে। কিন্তু ইনজেকসনে হাতে হাতেই ফল পাওয়া যায়। আগে ইনজেকসন যন্ত্র ছিল না। এখন এটায় চিকিৎসকের অনেক সুবিধা হয়েছে।

এক্স্-রে: এটাও একরকম ফটো। তবে ফটোতে যেমন একটা মানুষের দেহের উপরিভাগের ছবি ওঠে, এক্স্-রেতে ওঠে কেবল তার দেহের হাড়-পাঁজরের ছবি। এর ফলে শরীরের ভিতরে কোথায়

কি হয়েছে, কোথায় কোন্ হাড় কিভাবে চোট খেয়েছে—সব জানা যায়। আগে অনুমান করে এসব চিকিৎসা হত। তাতে ভুলও হত অনেক সময়। এখন সঠিকভাবে জানা যায়, শরীরের ভিতর কোথায় কি গলদ হয়েছে।

রক্তই মানুষের জীবন। খুব রক্তপাত হলে, কি অসুখে দেহ রক্তহীন হয়ে পড়লে মানুষ বাঁচে না। এরূপ রোগীর দেহে রক্ত তৈরি করা সহজ কথা নয়। ওষুধ দিয়ে রক্ত তৈরি করতে অনেক সময়ও লাগে। ততদিন রোগীকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না।

এখন অপর লোকের দেহের সতেজ রক্ত রোগীর দেহে ঢুকিয়ে দেওয়ার কৌশল আবিষ্কার করা হয়েছে। তার ফলে অনেক রক্তহীন, মর-মর রোগীও বেঁচে উঠছে।

আগেকার দিনে রোগের ঠিক ঠিক ওষুধ পাওয়া সহজ ছিল না। এটা-ওটা নানারকম ওষুধ দিয়ে দেখা হত—কোন্‌টা লেগে যায়। এখন কিন্তু রোগটা ধরতে পারলে তার ওষুধ সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া যাবে।

ফ্লেমিং নামে একজন বিজ্ঞানী একরকম জীবাণু নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। এই জীবাণু মানুষের দেহে অনেক রোগ তৈরি করে। একদিন তিনি হঠাৎ দেখলেন, তাঁর ঐ জীবাণুর উপর কিভাবে একটা ছাতা পড়েছে। বাদলার দিনে আমাদের জুতো জোড়া কয়েক দিন হাওয়ায় ফেলে রাখলে তার গায়ে যেমন সহজে গুঁড়ো মত ছাতা পড়ে—ঠিক তেমনি ঐ ছাতাটা।

ধুলো-বাতাস জীবাণুতে ভরা। ফ্লেমিং বুঝলেন, বাতাস থেকে কিভাবে ঐ ছাতার বীজ তাঁর ঐ জীবাণুর ভিতর এসে পড়েছে। কিন্তু কয়েকদিন পরে তিনি অবাক হয়ে দেখলেন, তাঁর ঐ রোগ-জীবাণুগুলি সব মরে গিয়েছে!—কি করে ওরা মরল? কি করে ওদের মারা যায় দিনরাত তিনি তাই-ই তো ভাবছিলেন! এইভাবে হঠাৎ আবিষ্কার হয়ে গেল যে, ঐ সবুজ ছাতার জীবাণুগুলিই ঐ রোগ-জীবাণুদের ধ্বংস করবার ঠিক ওষুধ। সে আজ চল্লিশ বছর আগের কথা। নানারকম অসুখ সারাতে এই ছাতার গুণ দেখে জগতের লোক অবাক হয়ে গেল। এর নাম দেওয়া হল—পেনি-সিলিন। নানাভাবে এই পেনিসিলিন আজকাল ব্যবহার করা হয়।

যাঁরা এইসব আবিষ্কার নিয়ে মাথা ঘামাতেন, তাঁরা জানলেন—এমন কতকগুলি জীবাণু আছে, যারা অপর জীবাণুকে পেলেই মেরে ফেলে। তাদের খুঁজে বের করা দরকার। খুঁজতে খুঁজতে

ওয়াকসম্যান নামে একজন বিজ্ঞানী এই ধরনের আর একটি জীবাণু পেলেন। তার নাম দেওয়া হল—ষ্ট্রেপটোমাইসিন। কান, নাক ও গলার চিকিৎসায়, টাইফয়েড, কলেরা—এমন কি যক্ষ্মা রোগেও ষ্ট্রেপটোমাইসিন হাতে হাতে ফল দেয়।

চিকিৎসকদেরও এখন সুবিধা হয়েছে ঢের। রোগের কথা শুনে এখন আর তাঁদের মাথায় হাত দিয়ে বড় একটা ভাবতে হয় না—কোন্ ওষুধের সঙ্গে কতখানি অন্য ওষুধ মিশিয়ে নিতে হবে! ওষুধ তৈরি করাই আছে—বড়ি, ক্যাপসুল ও ইনজেকসন দিয়ে সহজেই এখন চিকিৎসা হয়।

অস্ত্রোপচার :

অনেক সময় রোগীর শরীরে ধারালো ছুরি দিয়ে কাটাকুটি করে তাকে বাঁচাতে হয়। একে বলা হয়—অস্ত্রোপচার—অর্থাৎ অস্ত্রচিকিৎসা বা অপারেশন।

আগেকার দিনে অস্ত্র-চিকিৎসা ছিল এক ভয়াবহ ব্যাপার। রোগীর মরে গেলাম, মরে গেলাম চিৎকার শুনে অন্যান্য রোগীরা ভয়ে দুড়দাড় ছুটে পালাত। সামান্য দাঁত তুলতেও তখন রোগীকে জোর করে চিৎপাত করানো হত। তারপর ঢাক-ঢোল, কাঁসি বাজানো চলত—যাতে রোগীর চিৎকার শুনে অন্যান্য রোগীরা ভয়ে সরে না পড়ে!

তখন অস্ত্র-চিকিৎসায় রোগীর হাত-পা বেশ করে বেঁধে নেওয়া হত। তারপর কয়েকজন জোয়ান লোক তাকে চেপে ধরত। কাটা-কুটি করবার ছুরি-কাঁচি রোগীর সামনেই থাকত। তারা সেগুলি দেখে ভয়ে আধমরা হয়ে যেত। ছুরি চালানোর অসহ্য যন্ত্রণাতেই অনেকে প্রাণ হারাতো।

রোগী তার যন্ত্রণাটা যাতে বুঝতে না পারে, সেজন্য কেউ কেউ তার নাকে একরকম গাছের রস দিয়ে দিত। এই রসে রোগীর জ্ঞান থাকত না। কিন্তু তাতে অনেক সময় ফল হত উল্টো,—রোগীর জ্ঞান আর ফিরে আসত না। সে ওতেই মারা যেত।

কিভাবে রোগীকে এই ছুরি চালানোর যন্ত্রণা থেকে বাঁচানো যায়, তা' নিয়ে তখন ভাবছিলেন অনেকে। কয়েক রকম উপায় আবিষ্কার হল, কিন্তু কোনটাই খুব সুবিধার হল না।

এরপর সিমসন নামে এক বিজ্ঞানী আরও ভালো কিছু আবিষ্কার করা যায় কিনা দেখতে লাগলেন। একটা ওষুধ তিনি

পেলেনও, কিন্তু ওটা বিশেষ কাজে আসবে না মনে করে শিশিটা ফেলে দিলেন তাঁর বাজে কাগজের ঝুড়ির মধ্যে।

এর কিছুদিন পরে তিনি কয়েকজনকে নিয়ে আবার কাজে বসলেন। তিনি নানারকম ওষুধ পরীক্ষা করলেন, কিন্তু কোনটাতেই তেমন সুবিধা করতে পারলেন না। অবশেষে তিনি সেই ফেলে-দেওয়া ওষুধটাই পরীক্ষা করবার জন্য কুড়িয়ে নিয়ে এলেন সেই ঝুড়ির ভিতর থেকে।
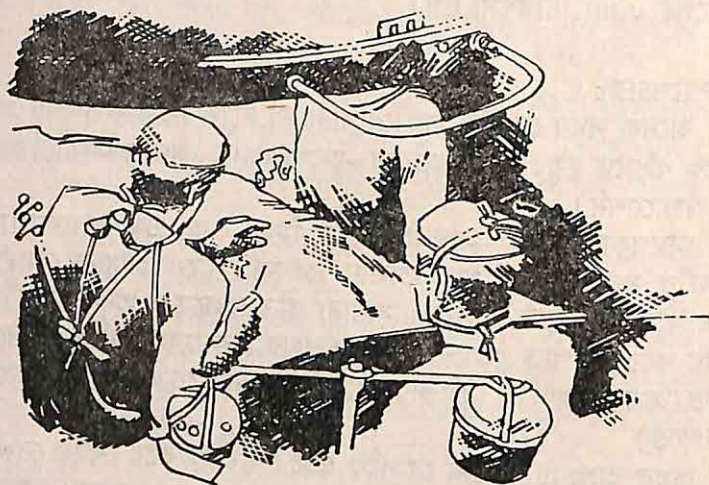
আধুনিক অস্ত্রোপচার

সকলেই তাঁরা ওষুধটা শুঁকলেন। তাঁদের মাথাটা কেমন অসাড় হয়ে ঘুম পেয়ে গেল। তারপর আর কি হল কেউ জানেন না। বেশ খানিক বাদে তাঁরা মেঝে থেকে উঠে বসলেন। চেতনা-নাশক যে ওষুধের খোঁজে সিমসন এতদিন দিনরাত লেগে ছিলেন, সেই 'ক্লোরোফরম' এইভাবে হঠাৎ আবিষ্কার হয়ে পড়ল! অস্ত্র-চিকিৎসায় ক্লোরোফরম আজকাল ব্যবহার করা হয়। এর ফলে রোগী তার যন্ত্রণাটা কিছুই টের পায় না।

এ ছাড়াও আজকাল আরও কয়েক রকম ওষুধ বেরিয়েছে যার কাজ দেহের কোনও বিশেষ জায়গার অনুভূতি শক্তিকে লোপ করে দেওয়া। এই ওষুধ শরীরের কোন জায়গায় ছোঁয়ালেই ঐ জায়গাটা

তখনই অসাড় হয়ে যায়।

এক্স্-রে: এক্স্-রের কথা আগেও কিছু বলা হয়েছে। এক্স্-রে শরীরের মাংস ভেদ করে হাড়-পাঁজরের ছবি দেখিয়ে দেয়। এক্স্-রে ফটো দেখে জানা যায়,—শরীরের ভিতরে কোথাও হাড়ের জোড় খুলেছে কিনা, হাড় ভেঙেছে কিনা অথবা চট্‌লা উঠেছে কিনা এইসব। অস্ত্র-চিকিৎসায় এক্স্-রে এমন একটা সুবিধা এনে দিয়েছে, যা কেউ কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি।

জার্মানীর রন্ট্‌জেন সাহেব একদিন কি একটা পরীক্ষা করছিলেন। তাঁর কাঁচের নলের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ চলবার সময় আলাদা আলাদা রংয়ের ঝিলিক দিচ্ছিল। কাছেই একটা কাঠের বাক্সের ভিতর ছিল ফটো তুলবার কতকগুলি কাঁচের প্লেট। যাতে আলো না লাগে সেজন্য প্লেটগুলি নীল মোটা কাগজ দিয়ে মুড়ে রাখা হয়েছিল। রন্ট্‌জেন সাহেব তার পরদিনই ঐ বাক্স খুলে প্লেটগুলি তুলে দেখেন, সেগুলি একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে! কেন এমন হল? ওতে আলো লাগল কি করে? প্লেটগুলিকে যেভাবে রাখা হয়েছিল তাতে ওগুলি নষ্ট হওয়ার কথা নয়। মুখ-আঁটা কাঠের বাক্সে নীল মোটা কাগজে জড়ানো যে প্লেট,—তাতে আলো লাগবে কোন্ পথে?

তিনি ঐ নানা রংয়ের বিদ্যুতের ঝিলিকগুলি পরীক্ষা করতে লাগলেন। আবিষ্কার করলেন, ওর ভিতর এমন একরকম আলো আছে, যা' কাঠ, কাগজ—এমন কি মাংসপেশী ভেদ করে যায়। বুঝলেন, ঐ আলোই কাঠ ও কাগজ ভেদ করে প্লেটের উপর পড়েছিল। তিনি নিজের একখানি হাত নিয়ে পরীক্ষা করে অবাক হয়ে গেলেন! তাঁর হাতের ভিতরের হাড়ের ছবিখানি কেমন ফুটে উঠেছে প্লেটের উপর!

এটা কোন্ আলো তখন তিনি তা' ধরতে না পারায় তখনকার মত তিনি তার নাম দিলেন,—এক্স্-রে অর্থাৎ অজানা আলো। শরীরের ভেতরের দিকটা—যা' আমরা কোনদিন দেখতে পাইনি, এক্স্-রে তা' আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে। অস্ত্র-চিকিৎসায় রন্ট্‌জেন সাহেবের এই দান তাঁকে অমর করে রাখবে। মানুষ তাঁর এই আবিষ্কারের জন্য চিরকাল কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁকে স্মরণ করবে।

রোগীর দেহে ছুরি চালাবার আগে তাকে 'ক্লোরোফরম' দেওয়া দরকার। আবার ছুরি চালাবার পরে 'কার্বলিক এ্যাসিড'ও না হলে চলে না।

একথা ভাবতেও অবাক হতে হয়। পঞ্চাশ বছর আগেও অস্ত্র-চিকিৎসার রোগী হাসপাতাল থেকে বড় একটা ফিরত না। কেউ ফিরলে রোগীর বরাত জোর বলা হত!

গোলাগুলি শরীরের কোথাও লাগলে সেখানটা বিষাক্ত হয়ে যায়। অনেক আগে সেখানটায় ফুটন্ত চিটে গুড় ঢেলে দেওয়া হত! তার যন্ত্রণাতেই অনেক রোগী মারা যেত!

একশো বছর আগেও রোগীর তলপেটে কোন ক্ষত হলে তার বাঁচার কোন আশা থাকত না।

আর আজ? তলপেটে অস্ত্র-চিকিৎসা আজকাল আকছার হয়ে থাকে। প্রায় সব রোগীই তাতে ভালো হয়ে যায়। এটা হল কি করে?—যোসেফ লিষ্টার রয়েছেন এর মূলে। তিনি ডাক্তারী পাশ করে অস্ত্রোপচারের দিকে ঝোঁক দিলেন বেশি। তিনি দেখলেন, অস্ত্র-চিকিৎসার পর বেশির ভাগ রোগীই হাসপাতালের নোংরামির জন্য মারা যায়। কেবল হাসপাতাল কেন, ডাক্তাররাও তখন রোগ-জীবাণু কিভাবে ছড়ায় তা' কমই জানতেন।

ধুলো-বাতাস ময়লায় কিভাবে রোগ-জীবাণু থাকে, কি করে তারা ছড়িয়ে পড়ে—লিষ্টার সকলকে তা' বুঝিয়ে দিলেন। কিছুটা কাজ হল। কিন্তু কি করে এদের সমূলে নিপাত করা যায়, দিনরাত তিনি ভাবতে লাগলেন। অনেক পরীক্ষার পর তিনি আবিষ্কার করলেন—কার্বলিক এ্যাসিড। এটা রোগ-জীবাণুগুলিকে ধ্বংস করে দেয়। অস্ত্রোপচারের ছুরি-কাঁচিগুলিও ফুটন্ত গরম জলে রেখে ওষুধ দিয়ে ধুয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা তিনি করলেন।

অস্ত্রোপচারের সময় ডাক্তার ও নার্সদের নাকে ওষুধ-দেওয়া পাতলা কাপড় ব্যবহার করা চালু করেন তিনি। জীবাণুগুলি যাতে কোন দিক দিয়েই না আসতে পারে তাই তিনি দেখতেন। এসব করায় সুফলও পাওয়া গেছে খুব। এখন এইসব ব্যবস্থাই চলে আসছে। এর ফলে অস্ত্রোপচারের রোগীদের আর ভয়ের কোন কারণ নেই।

আগে যাঁরা অস্ত্রোপচারের অসহ্য কষ্ট পেয়ে মারা গিয়েছেন, তাঁদের জন্য আমরা দুঃখ বোধ করি। আর যাঁদের অক্লান্ত চেষ্টায় অস্ত্রোপচারের রোগীদের যন্ত্রণা দূর হয়েছে এখন—তাঁদের আমরা ধন্যবাদ জানাই। তাঁদের কাছে আমরা অশেষ ঋণী।

সবাক-চিত্র পাওয়া

আমরা সিনেমায় গিয়ে আজকাল কথা শুনি, গান শুনি, ছবিও দেখি। ব্যাপারটা খুব জীবন্ত বলে মনে হয়। আসলে কিন্তু ওগুলি ফটো। সিনেমার প্রথম যুগে ছিল নির্বাক চিত্র। ফটোর হাবভাব, চলাফেরা থেকে কাহিনীটা কল্পনা করে নিতে হত। কেউ কথা বলত না সে ছবিতে।

তারপর আবিষ্কার হল কথা আর গানের ছবি। গানের ছবি! গান কি দেখা যায় যে, তার ছবি তোলা যাবে? যেসব জিনিষ আমরা
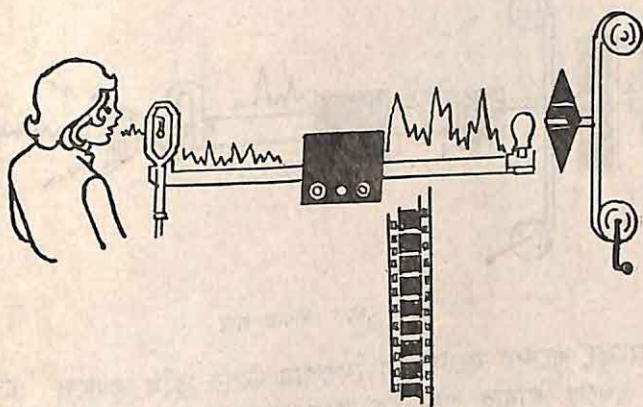
ফিল্মের ভেতর গান ও কথার ছবি তোলা হচ্ছে

দেখতে পাই, ধরতে পারি, ছুঁতে পারি, তারই তো ছবি তোলা যায়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা কথা এবং গানের ছবিও তুলছেন। তাতেই আমরা পাচ্ছি সবাক চিত্র।

গ্রামোফোনের রেকর্ডের উপর যে অসংখ্য গোল গোল আঁচড় কাটা আছে, ওগুলিই হল সব গানের ছবি। সিনেমার কথা ও গানের ছবি হল ফটোগ্রাফ করা—ফিল্‌মের উপরে। ফিল্‌মের উপরে যেমন মানুষের ছবি থাকে, ঠিক তারই পাশে তেমনি থাকে গান এবং কথার ছবি।

ফোটোগ্রাফির বড় কথা হল, যেখানটায় জোরালো আলো পড়বে, ছবিতে সেই জায়গাটা দেখাবে সাদা, আর যেখানে কম আলো পড়বে, সেখানটা দেখাবে কালো।

মাইকের সামনে কথা বললে কারেন্টের ঢেউ ওঠে। এই ঢেউয়ের সাহায্যে একটা বাতি জ্বালানো হয়। বেশি কারেন্ট গেলে বাতি জোরে জ্বলে ওঠে, কম কারেন্ট গেলে বাতির জোর কমে যায়। এখন যে ফিল্‌মের উপর শব্দের ফটো তোলা হবে তাকে ঘোরানো হতে লাগল। কারেন্টের ঢেউয়ের উঠতি-পড়তির সঙ্গে সঙ্গে বাতিটাও কম-বেশি জ্বলতে থাকে। ফলে ফিল্‌মের উপরেও কখনও জোর আলো পড়ে, কখনও বা পড়ে কম। তাই ফিল্‌মের উপর কোথাও সাদা কোথাও কালো দাগ দেখা যায়।
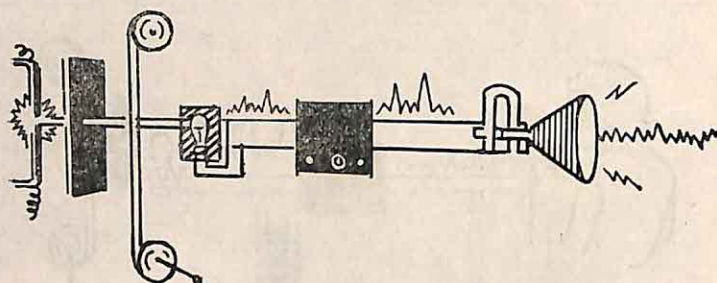
ফিল্ম থেকে আবার শব্দ

আচ্ছা, শব্দের ফটো তো ফিল্মের উপর তুমি তুললে। এখন ঐ ফিল্ম থেকে আবার শব্দ কি করে শোনা যাবে? এজন্যে শব্দের ফিল্মের পিছনে একটা আলো রাখতে হবে। স্বচ্ছ সেলুলয়েড দিয়ে ফিল্ম তৈরি বলে তার সাদা-কালো অংশের ভেতর দিয়ে কম-বেশি আলো বাইরে বেরিয়ে আসবে। এই কম-বেশি আলো যখন একটা মজার যন্ত্র—যার নাম ফটোসেল—তার উপর গিয়ে পড়ে তখন একটা কারেন্টের ঢেউ সৃষ্টি করে। ফটোসেলের উপর আলো পড়লে তবেই তার থেকে কারেন্ট পাওয়া যাবে। এই কারেন্টের ঢেউকে আর একটা যন্ত্রের সাহায্যে জোরালো করে স্পীকারের মধ্যে পাঠানো হয়। বাতাসের ঢেউ উঠবে সেখানে আর আমরা তখন শব্দ শুনতে পাব।

ফিল্মের উপর শব্দের ফটো তোলবার আরও অনেক রকম উপায় আছে। বড় হয়ে তোমরা তা জানবে।

মনে রাখতে হবে, কথার ছবি এবং দৃশ্যের ছবি একই ঘরে বসে তোলা হয় না। আলাদা ঘরে তোলা হয়। তারপর ঐ নেগেটিভ দু'খানা এক করে একখানা ফিল্ম তোলা হয়,—যার এক পাশে থাকে শব্দের ছবি, অন্য পাশে থাকে দৃশ্যের ছবি।

ঘরবাড়ী তৈরি করা

এখন আমরা নানারকম ঘরবাড়ী তৈরি করে ফেলছি। কিন্তু এটা আগেকার মানুষের পক্ষে খুব সহজ ছিল না। নানারকম কৌশল খাটাতে খাটাতে এখন আমরা এইসব ঘরবাড়ী তৈরি করতে শিখেছি।

ঘরবাড়ী কিন্তু সকলেরই দরকার, অথচ আগেকার মানুষ কি করে ঘর তৈরি করতে হয় তা জানতই না!

একটা আশ্রয় চাই সকলেরই। তাই আদিকালের মানুষ পাহাড়ের গুহায় অথবা গাছের ডালে বাস করত।

কে প্রথম ঘর তৈরি করেছিল তার নাম জানা যাবে না। তবে কি ভাবে প্রথম ঘর তৈরি হল তা' অনুমান করা যায়।

প্রাচীন যুগের মানুষ ছিল যাযাবর। পশুপালনই ছিল তাদের জীবিকার প্রধান উপায়। পশু নিয়ে তারা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়াতো। কিন্তু ঘুরে বেড়ালেও মাথা গোঁজবার জায়গা চাই একটা। গুহায় বাস করত অনেকে, কিন্তু গুহা তো আর সব জায়গায় মেলে না। এই জন্য তারা তৈরি করল খুঁটির উপর চামড়া দিয়ে ছাওয়া এক রকম তাঁবু। এটা ইচ্ছামত গুটিয়ে নেওয়া যেতো। আজও আমরা দেখতে পাই, বেদেরা তাদের ছাগল-গাধা-ঘোড়া নিয়ে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। তাদের সঙ্গে অবশ্য থাকে হোগলা দিয়ে তৈরি একরকম তাঁবু।

কিন্তু তাঁবু তো আর ঘর নয়। মানুষকে স্থায়ী ঘর বাঁধতে বাধ্য করলো তার চাষবাস। চাষ করতে যেদিন মানুষ শিখলো, সেই-দিনই হলো তার সভ্যতার প্রথম সূচনা। দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ালে তো আর চাষবাস চলে না। জমি চাষ করে সময়মত বীজ ছড়ানো চাই। তারপর ফসল রক্ষা, শস্য কাটা, শস্য ঘরে তোলা এবং সবশেষে শস্য ভালো জায়গায় মজুত রাখা চাই। এসব করতে হলে ক্ষেত-খামারের কাছেই চাই স্থায়ী ঘরবাড়ী।

ঘরবাড়ী তৈরি করবার আগে প্রথমেই লক্ষ্য করতে হবে—সেখানকার আবহাওয়ার অবস্থা। আবহাওয়া বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম। সেইজন্য ঘরবাড়ীও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম করতে

হয়েছে। জাপানে ভূমিকম্প হয় খুব বেশি। সেজন্য সেখানে কাঠের বাড়ী তৈরি করে। ইংল্যান্ডের অধিকাংশ বাড়ীরই ভিত উঁচু নয়, মাটির সঙ্গে প্রায় সমতল। ওসব বাড়ীর খোলা বারান্দা নেই। ঘরের দেওয়ালের মধ্যে থাকে উনুন। তাতে ঘরটা বেশ গরম থাকে। ইংল্যান্ড শীতপ্রধান দেশ।

আমাদের দেশে কিন্তু ওই ধরনের ঘর অচল। আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান। এখানে সাপ-ব্যাং আছে, বৃষ্টির জল আছে। কাজেই এদেশের ঘরের ভিতটা বেশ উঁচু রাখতে হয়। ফাঁকা বারান্দাও আমাদের দরকার হয়।

আমাদের দেশে পল্লীগ্রামের অধিকাংশ বাড়ীই খড় দিয়ে তৈরি। খড়ের ঘর কয়েক রকমের দেখা যায়—যেমন, বাংলা, চৌরী, আটচালা এবং দো-চালা।

বাংলা ঘর আর বাংলো ঘর কিন্তু এক জিনিষ নয়। বাংলো হচ্ছে ইংরেজী কথা। ওর চারদিকে খোলা বারান্দা রাখা হয়। বাংলা ঘর হচ্ছে দো-চালা। এ ঘর দেখতে অনেকটা মন্দিরের মতন। আজকাল বড় একটা এ ধরনের ঘর তৈরি হয় না। চারখানি চাল দিয়ে তৈরি হয় চৌরীঘর। এই চৌরীঘরের সঙ্গে আরও ঐরকম চারখানি চাল জুড়ে দিয়ে ঘরটা খুব বড় করে নিলে হয় আটচালা।

খড়ের ঘরের ঝঞ্ঝাট অনেক। তিন-চার বছর বাদে খড়ের ঘর নতুন করে ছাইতে হয়। তা' ছাড়া খড়ের ঘরে আগুন লাগার ভয়ও কম নয়। এই জন্যে খড়ের বদলে অনেকে তৈরি করছেন টালির ঘর। মাটি দিয়ে তৈরি হয় টালি।

আমরা কথায় বলি—টিনের বাক্স, টিনের ঘর এইসব। কিন্তু বাস্তবিক ওগুলি টিনের নয়। ইস্পাতের পাতলা চাদরের উপর টিনের কোটিং বা ছোপ থাকে মাত্র। ঘর তৈরির কাজে ঢেউ খেলানো টিনই সুবিধাজনক। টালি ভেঙ্গে যেতে পারে, ভারীও খুব। টিন ভারী নয়, টিনকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সহজে নেওয়া যায়; কিন্তু একটা অসুবিধা আছে টিনের—রৌদ্রে সহজেই গরম হয়ে পড়ে। এজন্য কেউ কেউ য়্যাজবেষ্টসও ব্যবহার করেন। এতে আগুন লাগে না, সহজে গরমও হয় না।

কিন্তু মানুষ চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগল আরও ভালো ও মজবুত ঘরবাড়ী তৈরি করবার। এজন্য মাথা খাটিয়ে তৈরি হল ইট। প্রথমে চূণ-সুরকী দিয়েই ইটের বাড়ী বা পাকা বাড়ী তৈরি হত। তারপর আবিষ্কার হল সিমেন্ট। সিমেন্ট আবিষ্কার হওয়ার

পর থেকেই বড় বড় বাড়ী তৈরি হতে লাগল। আজকাল ইঞ্জিনীয়ারী বুদ্ধি খাটিয়ে লোহার শিক ও সিমেন্টের সাহায্যে আকাশছোঁয়া সব বাড়ী তৈরি হচ্ছে।

ধাতু দ্রব্য পাওয়া

আজকাল আমরা থালা, বাসন, খুন্তী, কড়াই, ঘড়ি, আংটি, টাকা-পয়সা, আরও কত কি ধাতুর জিনিষ যেখানে সেখানে দেখতে পাই। কিন্তু আদিম কালের মানুষ এইসব ধাতুর জিনিষের কথা ভাবতেও পারেনি। মাটিই ছিল তাদের পরিচিত। মাটি দিয়ে তারা হাঁড়িকুড়ি,

প্রাচীন কালের তামা নিষ্কাশন পদ্ধতি

খেলনা পুতুল, এমন কি বই পর্যন্ত তৈরি করত মাটির টালি দিয়ে।

মাটির উপরেই তারা পেয়ে গেল পাথর। পাথর দিয়ে তারা কুড়ুল, হাতুড়ী, বল্লম প্রভৃতি নানারকম অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করত। এই সময়টাকে বলা হয় প্রস্তর যুগ। তারপর তারা আবিষ্কার করল

ব্রোঞ্জ। ব্রোঞ্জ দিয়েও অনেক কিছু তৈরি করল তারা। এই সময়টাকে বলে ব্রোঞ্জ যুগ। তারপর তাম্র যুগ। এরপর মানুষ আবিষ্কার করল লোহা। লোহা আবিষ্কারের পরই মানুষের ভবিষ্যৎ গড়ে উঠল। এখন পর্যন্ত মানুষ লোহা দিয়ে নতুন নতুন কত কিছু তৈরি করে চলেছে। লোহার জিনিষ ব্যবহার করে না এমন কোন গৃহস্থ নেই। লোহা আবিষ্কারের পরই মানুষ সোনা, রূপা, পারদ, নিকেল, টিন, সীসে এবং এ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতু আবিষ্কার করে। ধাতু কোথা থেকে আসে? সব ধাতুই থাকে মাটির নীচে ধাতব পদার্থ হিসাবে। মানুষ বুদ্ধি খাটিয়ে তাদের বের করে আনে। যেখানে ধাতু থাকে সেখানটাকে বলা হয় খনি। খনি থেকে ধাতবপদার্থকে সুকৌশলে বের করে বিভিন্ন রকম আগুনের চুল্লীতে সেগুলিকে গালিয়ে নেওয়া হয়। ধাতব পদার্থের অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিতে হয় নানারকম রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে।

চকচক করলেই অবশ্য সোনা হয় না, কিন্তু সব ধাতুকেই চকচকে করা যায় পালিশ করে। ধাতুগুলির রং বিভিন্ন। সোনা হলুদ, রূপা সাদা, তামা লালচে, লোহা ধূসর। টিন, এ্যালুমিনিয়াম, পারদ এবং আরও কয়েকটি ধাতু রূপার মত চকচকে। তামাকে ঘষেমেজে সোনার মত দেখতে করা যায়—কিন্তু মূল্যের দিক দিয়ে দুটি ধাতুর আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

সোনার দাম বেশি হলেও কাজের দিক থেকে লোহাই কিন্তু ফার্স্ট! লোহা ছাড়া কোন্ কাজটা সম্ভব? আমাদের রোজকার জীবনে লোহা ছাড়া চলতে পারে না।

তা হলে সোনার এত দাম কেন? সোনা দেখতে খুব সুন্দর, সহসা ক্ষয়ে যায় না এবং লোহার মত প্রচুর পাওয়াও যায় না। সেই-জন্য এর দাম বেশি। সোনার দামের উপরই সবদেশে দ্রব্যমূল্য নির্ভর করে। খাঁটি সোনা কিন্তু খুব নরম। মুদ্রা বা গহনা তৈরিতে সেজন্য সোনার সঙ্গে তামা বা রূপা মিশিয়ে নিয়ে মুদ্রা বা গহনাপত্র করা হয়।

আজকাল মাটির হাঁড়ি বা পেতল-কাঁসার থালা-বাসনকে সরিয়ে দিয়েছে এ্যালুমিনিয়াম। সাধারণ গৃহস্থ ঘরে এখন এ্যালু-মিনিয়ামের জিনিষপত্রের ছড়াছড়ি! কিন্তু মাত্র দেড়শো বছর আগেও এই ধাতুটি ছিল বহু মূল্যবান। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে এ্যালুমিনিয়ামের দাম ছিল প্রতি সের ৩,২৭০ টাকা! বছর চারেক পরেই এই দর নেমে আসে ২০৫ টাকায়। আরও কয়েক বছর পরে প্রতি সের একশো টাকায় নেমে আসে এ্যালুমিনিয়ামের দাম!

তৃতীয় নেপোলিয়নের রাজ-অতিথিদের জন্য এই এ্যালুমিনিয়াম দিয়েই একদিন ডিস, চামচ প্রভৃতি তৈরি হয়েছিল। তখন বড় বড় রাজা-মহারাজারাই এ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করতে পারতেন। গরীবরা দূর থেকে এ্যালুমিনিয়ামের কথা শুনত, কখনও বা উঁকি-ঝুঁকি মেরে টেবিলের উপর এ্যালুমিনিয়ামের চামচে দেখে জন্ম সার্থক করত!

প্রাচীন কালের লোহা নিষ্কাশনের উপযোগী চুল্লী

এই ধাতু আবিষ্কার করেছিলেন আমেরিকার চার্লস্ মার্টিন হল আর ফ্রান্সের পল লুই তুঁস্যা। আবিষ্কারের পর তিরিশটি বছর যেতে না যেতেই এ্যালুমিনিয়াম একেবারে পথে এসে দাঁড়াল! এখন দূর-দূরান্তর পাড়াগাঁয়ের অতি বড় গরীবের ঘরেও এ্যালুমিনিয়ামের রাজত্ব।

গত পঞ্চাশ বছরে এ্যালুমিনিয়াম একটা যুগান্তর এনেছে বলা যায়। এটা দেখতে রূপোর মত সুন্দর, অত্যন্ত হালকা, সহজে নমনীয়।

এসব ছাড়া আরও অনেকগুলি ধাতু আছে। যেমন—টেলুরিয়াম, রেডিয়াম এইসব। কিন্তু সাধারণ মানুষের খুব একটা কাজে আসে না সেগুলি. বিজ্ঞানীদের কাছে সেগুলি খুবই দরকারী।

ছাপাখানার কথা

আজকের দিনে কোনও বিষয় সম্বন্ধে জানতে গেলে আমরা ঐ বিষয়ে কত বই পেতে পারি। রং-বেরংয়ের ছবি আঁকা, মুক্তোর মতো ঝর্‌ঝরে টাইপে ছাপা বই দেখলে মনটা খুশীতে ভরে ওঠে। ছাপাখানার যেমন উন্নতি হয়েছে—ঠিক তেমনি কাগজেরও উন্নতি হয়েছে অসম্ভব রকমের। ম্যাপলিথো কাগজ, আর্ট পেপার ইত্যাদিতে ছাপা বই তো তোমরা আজকাল হামেশাই দেখে থাকো।

কিন্তু ছাপাখানার আজকের অবস্থায় আসতে মানুষের লেগেছে অনেক অনেক বছর। কাগজ যখন আবিষ্কার হয়নি তখন কাঁচা মাটির উপর কাঠি দিয়ে লিখে পরে সেগুলি আগুনে পুড়িয়ে পর পর সারবন্দী করে রেখে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। তখনকার দিনে এক একখানা বই লেখা বা পড়ার ব্যাপারটা তা'হলে বুঝে দেখ! অনেক সময় চামড়ার উপরেও বই লেখা হত। খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল লেখা হয়েছিল ভেড়ার চামড়ার উপর হিব্রু ভাষায়। তালপাতা, ভূর্জপত্র, গাছের বাকল প্রভৃতির উপর পণ্ডিতেরা পুঁথি রচনা করতেন। তাঁদের এইসব হাতে-লেখা বইকে পুঁথি বলা হত। তখনকার দিনে যিনি যত বড় বিদ্বান হতেন—তাঁকে তত বেশি পুঁথি লিখতে হত। হিউয়েন সাঙ ভারত থেকে ফিরে যাওয়ার সময় ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন ভারতের পণ্ডিতদের লেখা হাজার হাজার বাণ্ডিল সব পুঁথি।

এরপর আবিষ্কৃত হল কাগজ। জার্মানীর জোহান গুটেনবার্গ সর্বপ্রথম কাঠের অক্ষর দিয়ে ছাপাখানার কাজ শুরু করেন। কিন্তু কাঠের অক্ষর কালিতে কালিতে নরম হয়ে গেলে সহজেই ভেঙে যায়। তখন গুটেনবার্গ তাঁর এক বন্ধুকে দিয়ে ধাতুর অক্ষর তৈরি করে নিলেন। এই অক্ষর দিয়ে তাঁরা পাঁচ বছর ধরে সমগ্র বাইবেল গ্রন্থটি ছাপলেন। সেটা ১৪৫৩ সালের কথা। এই বইয়ের প্রতি পাতায় বিয়াল্লিশটি করে লাইন ছিল। এটাকেই ইউরোপের প্রথম ছাপা বই বলে সবাই মেনে নিয়েছেন। গুটেনবার্গের এই বই ছাপার পর ক্রমে আবিষ্কৃত হয় সীসার টাইপ ও ছাপাখানা।

আজকালকার আধুনিক ছাপাখানায় সীসার সঙ্গে এ্যান্টিমনি ধাতু মিশিয়ে ছাঁচে ঢালাই করে এই অক্ষর বা টাইপ তৈরি হয়। অবশ্য সামান্য অন্য ধাতুর মিশ্রণও থাকে এর মধ্যে। এই টাইপগুলি তৈরি করার সময় তার অক্ষরগুলি লেখা হয় উল্টো করে আর তার উপর কালি মাখিয়ে কাগজে চাপ দিলে সোজা অক্ষর ফুটে ওঠে!

নিজের লেখা গল্প কিংবা কবিতা যখন ছাপার হরফে দেখ—তখন তোমাদের খুব আনন্দ হয়, তাই না? ছাপাখানায় তোমাদের এই লেখা যারা অক্ষরের পর অক্ষর বসিয়ে সাজান তাঁদের বলা হয় কম্পোজিটর। লেখার দিকে নজর রেখে এরা দিব্যি অক্ষরগুলো এক এক করে টেনে নিয়ে লাইনের পর লাইন কম্পোজ করে যান।

অক্ষরগুলিকে আলাদাভাবে চিনবার জন্য তাদের নামও আছে অনেক রকম। যেমন—পাইকা, স্মল পাইকা, গ্রেট, প্রাইমার ইত্যাদি। আজকাল বড় বড় ছাপাখানায় হাতে কম্পোজ না করে টাইপ রাইটারের মতো টিপে টিপে যন্ত্রে অনেক তাড়াতাড়ি কম্পোজ করা যায়। লাইনো টাইপে কম্পোজ করবার সময় অপারেটর চাবি টিপে এক এক করে অক্ষরগুলো টাইপ করতে থাকেন। একটা লাইন শেষ হয়ে যাওয়ার পর সব লাইন টাইপটাই ঢালাই হয়ে বেরিয়ে আসে। এটাকে সংক্ষেপে লাইনোও বলা হয়। মনো-টাইপে প্রথমে চাবি টিপে একটা টেপ-কাগজের উপর অক্ষরগুলোর খোদাই ছাপ তোলা হয়। তারপর ঐ খোদাই ছাপ তোলা টেপ-কাগজকে ঢালাই মেশিনের মধ্যে ফেললে এক একটি অক্ষর ঢালাই হয়ে বেরিয়ে আসে। লাইনো এবং মনো দুটোতেই কম্পোজের কাজ দ্রুত করা যায় আর আধুনিক মুদ্রণযন্ত্রে ছাপাটিও হয় বেশ ঝরঝরে।

নিরক্ষরের হস্তাক্ষর পাওয়া

আমরা পড়তে শিখে অনেক বইপত্র পড়তে পারি। তাতে আমরা অনেক কথা জানি। আর লিখতে শিখে আমরা আমাদের মনের কথা জানাতে পারি অপরকে। কেবল চিঠিপত্রেই যে আমরা মনের কথা জানাই তা' নয়। কারও কাছে কিছু বিক্রয় করে আমরা টাকা পেলাম। তার স্বীকৃতি জানালাম নাম সই করে। এই দস্তখত বা নাম সই জানিয়ে দিল, আমি টাকা পেয়েছি—এই স্বীকৃতি। একটা মণি অর্ডার এল তোমার নামে। তুমি পিয়নের কাছে তোমার নাম সই করে টাকা নিলে। ওটাই হল তোমার স্বীকৃতি। পরে তুমি বলতে পারবে না, তুমি টাকা পাওনি।

হ্যাঁ, জাল-জুয়াচুরিও হতে পারে। মণি অর্ডারের ফরম-এ আর একজন তোমার নাম সই করে টাকা নিয়ে গেল। তখন উপায়? তুমি বলবে, আমি টাকা পাইনি। পোষ্ট অফিস বলবে, এই দেখ তুমি সই করে টাকা নিয়েছ। তুমি বলবে, এ সই মোটেই আমার নয়। সই-বিশারদ লোক আছেন। তখন তাঁদের ডাক পড়বে। তাঁরা তোমার সই ও হাতের লেখা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখবেন। তাঁরা বলবেন, এই সই তোমার নয়। তখন সেই পিয়ন কার কাছে সই পেয়েছে তা' বলবে। তার সাক্ষীও থাকবে ঐ ফরমে। তখন যে মিথ্যে সই করে জালিয়াতি করেছে সে ধরা পড়বে। স্বর্ণলতা বইয়ে 'গডাচর চনদ্র' গোপালের নামে-আসা মণি অর্ডারের টাকা জাল সই করে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে, এ গল্প তোমরা পড়েছ।

কিন্তু আমাদের দেশের অনেক লোকই তো এখনও নিরক্ষর। তারা সই করতে জানে না। তাদের বেলা কি হবে? দলিল-পত্র, মণি অর্ডার, রসিদ দেওয়া এসব ব্যাপারে তো সই চাই-ই।

তোমরা বলবে : কেন, তারা টিপ সই দেবে! চট্ করে তোমরা কথাটা বলে দিলে, কারণ, তোমরা যখন-তখন দেখছ যে, লোকে টিপ সই দেয়। কিন্তু এ বুদ্ধিটা চট্ করে মানুষের মাথায় আসেনি, সেজন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয়েছে অনেক।

আঙ্গুলের ছাপ চিরকালই কি এক থাকে? তা'ছাড়া একজনের

আঙ্গুলের ছাপও তো আর একজনের আঙ্গুলের ছাপের সঙ্গে হুবহু মিলেও যেতে পারে! তখন?

না, পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, আঙ্গুলের ছাপ পাল্টায় না। ছোট থেকে আমরা বড় হই। আঙ্গুলের ছাপও সঙ্গে সঙ্গে বড় হতে থাকে, কিন্তু বদলে যায় না; ভিতরের রেখাগুলির ছাপ একই রকম থাকে।

আর একটা আশ্চর্যের কথা, পৃথিবীর কোন মানুষের আঙ্গুলের ছাপের সঙ্গে আর একজনের ছাপ মেলে না!

স্যার ফ্রান্সিস গ্যান্টন একবার কয়েক লক্ষ মানুষের আঙ্গুলের ছাপ মিলিয়ে দেখেছিলেন, তাতে তিনি একজনের সঙ্গে আর এক-জনের কোনও মিল খুঁজে পাননি!

আঙ্গুলের ছাপ নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন, তাঁরা এই ছাপকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করেছেন :

(১) খিলান (Arch) (২) ফাঁস (Loop) (৩) চক্র (Whorl)
(৪) মিশ্র (Composite)।

আঙ্গুলের রেখার গতি অর্থাৎ কোন্ দিক থেকে রেখাটা কোন্ দিকে যাচ্ছে সেই অনুসারে এই শ্রেণী বিভাগ হয়েছে। আঙ্গুলের ছাপের বিভিন্ন ছবি দেখলেই তা বুঝা যায়।

এই চারটি বিভাগের অন্তর্গত প্রত্যেকটি রেখার মধ্যে আবার বিভিন্ন লোকের রেখার গতি বিভিন্ন রকম। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, আঙ্গুলের ছাপের একটা বংশজাত বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বৈশিষ্ট্য ঐ বংশের বিভিন্ন লোকের আঙ্গুলে বর্তমান থাকে। যমজ ভাই বা বোনের আঙ্গুলের রেখায় খানিকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও একজনের আঙ্গুলের রেখা অন্যজনের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়।

এর থেকে আমরা বুঝতে পারছি, নাম সইয়ের চেয়েও আঙ্গুলের ছাপ বেশি বিশ্বাস করা যেতে পারে; কারণ সই বয়স ভেদে পাল্টাতে পারে, একজনের সই বা হাতের লেখা হুবহু অন্যের মতো হতে পারে, কিন্তু টিপ সইতে তা পারে না। অপরাধী ধরতে আঙ্গুলের ছাপ পুলিশকে খুব সাহায্য করে।

চুরি, ডাকাতি, খুন প্রভৃতি দুষ্কার্য করার সময় অপরাধীর আঙ্গুলের দাগ সিন্দুকের হাতলে, কাচের গেলাসে, দেওয়ালের গায়ে অথবা তাদের ফেলে-যাওয়া ছোরা বা টর্চ লাইটের গায়ে লেগে থাকে। অবশ্য তারা সেটা বুঝতে পারে না। পুলিশ গিয়ে তাদের সেইসব

আঙ্গুলের ছাপ নিয়ে পরীক্ষা করে। মনে রাখতে হবে, পুলিশের ঘরে হাজার হাজার অপরাধীর আঙ্গুলের ছাপ জমা থাকে। ছাপের সঙ্গে অপরাধীর নাম-ধামও লেখা থাকে। আঙ্গুলের ছাপ-বিশারদ ঐ সব ছাপের সঙ্গে মিলিয়ে অনেক সময় অপরাধীর হদিস পান। দলিল-পত্রে আঙ্গুলের ছাপের নিচেয় লেখা থাকে অমুকের এল. টি. আই. অর্থাৎ বাম হাতের বুড়ো আঙ্গুলের ছাপ। বাঁ-হাত ও বুড়ো আঙ্গুলের ছাপ নেওয়ার নিয়ম এইজন্য যে, ডান হাতে কাজ হয় বেশি; তার ফলে আঙ্গুলের রেখাগুলি অনেক সময় ঘষায় ঘষায় কিছুটা ক্ষয়ে যায়। কিন্তু বাঁ-হাতে কাজ কম হয় বলে, ঐ হাতের বুড়ো আঙ্গুলের রেখাগুলি বেশ পরিষ্কার থাকে।

বহু লোককে একসঙ্গে কথা শোনানো

আগেকার দিনে বহু লোককে কোন খবর জানাতে হলে লোকে হাটে ঢেঁড়া পিটিয়ে জানিয়ে দিত। এটা অবশ্য পাড়াগাঁয়ের ব্যাপার। শহরেও রাস্তায় রাস্তায় ঢেঁড়া দিয়ে কোথাও কোন ব্যাপার হলে তা জানানো হত। অনেক লোকের সম্মুখে বক্তৃতা দিতে হলে বক্তা একটা উঁচু কিছুর উপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করে তাঁর বক্তব্য বলতেন।

কিন্তু এখন দশ-বিশ হাজার লোকের সমাবেশেও বক্তাকে চিৎকার করে গলা ফাটাতে বা উঁচু জায়গায় দাঁড়াতে হয় না। এখন কত সহজেই আমরা একসঙ্গে বহু লোককে আমাদের কথা শোনাতে পারি।

বিদ্যুৎশক্তি আবিষ্কারের পর কত কিছুই না আমরা সহজে পেয়ে গিয়েছি। মাইক্রোফোন বা মাইকও তার মধ্যে একটি। মাইকের সাহায্যে আমরা বহু লোককে আমাদের বক্তৃতা, গান-বাজনা শোনাতে পারি। এটাকে লাউড স্পীকারও বলা হয়; কারণ আমাদের কথাকে এই যন্ত্র 'লাউড' অর্থাৎ চিৎকার করে শুনিয়ে দেয়।

আমরা জানি, শব্দ জিনিষটা বায়ুর ঢেউ ছাড়া আর কিছু নয়। বায়ুতে ছোট-বড় ঢেউ উঠলে হয় শব্দের সৃষ্টি। মাইক যন্ত্রের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ এই শব্দকে বাড়িয়ে দেয়। তার ফলে অনেক দূরেও শব্দটা যায়।

আবহাওয়ার খবর জানা

আজকাল খবরের কাগজ খুললেই আমরা জানতে পারি আবহাওয়ার সংবাদ : ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে, আকাশ মেঘলা থাকবে। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ইত্যাদি। এই সংবাদে আরও জানা যায়, প্রচণ্ড ঝড় ঘন্টায় কত কিলোমিটার বেগে কোথা দিয়ে বয়ে যাবে এইসব। এর ফলে নাবিকরা সাবধান হতে পারে, যে অঞ্চল দিয়ে প্রচণ্ড ঝড় ছুটে যাবে সেই অঞ্চলের লোকও হুঁশিয়ার থাকতে পারে।

কিন্তু আগেকার দিনে আবহাওয়ার এতসব খবর জানা সম্ভব ছিল না। সম্ভব না থাকলেও আবহাওয়ার খবর জানার প্রয়োজন ছিল খুবই।

আগেকার দিনের লোকের আবহাওয়ার খবর জানবার কোন যন্ত্রপাতি ছিল না। প্রকৃতি থেকেই অভিজ্ঞতা দিয়ে যতখানি সম্ভব তারা ঝড়-বৃষ্টির খবর জেনে নিত।

ঝড়-বৃষ্টি হবে কিনা তা' জানবার জন্য তাদের তাকিয়ে থাকতে হত আকাশে—মেঘের দিকে। এইভাবে কোন্ মেঘে জল হবে না, কোন্‌টা ঝোড়ো মেঘ, কোন্‌টায় প্রচণ্ড বর্ষণ হবে তা' তারা জেনে নিত। ব্যাং ডাকলে, সার বেঁধে পিঁপড়ে উপরের দিকে উঠলে, পুকুর বা কুয়ার জল গরম মনে হলে তারা বুঝত বৃষ্টি হবে।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক উপায়ে আবহাওয়া বুঝবার প্রথম যে জিনিষটির আবির্ভাব হলো, সেটাকে আজকালকার বাতাসের দিক্ নির্ণয় যন্ত্রেরই প্রথম সংস্করণ বলা যায়। এটায় বাতাস কোন্ দিক দিয়ে বইছে সেটাই কেবল ধরা পড়ত।

এজন্য গ্রীসের এথেন্স শহরে আটকোণা একটা স্তম্ভের উপর সমুদ্র-দেবতা ট্রাইটনের একটি মূর্তি রাখা ছিল। মূর্তিটির হাতে ছিল একটি দণ্ড। বাতাসের দিক্ পরিবর্তন হলে এই দণ্ডটিও ঘুরে যেত।

এরপর জল-বাতাসের উত্তাপ মাপা সম্ভব হল ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানী ফারেন হাইটের থারমোমিটার আবিষ্কারের পর।

তারপর বাতাসের ওজন বা বায়ুচাপ পরিমাপের পথ দেখিয়ে দিলেন বিজ্ঞানী টরিসেলী তাঁর ব্যারোমিটার আবিষ্কার করে। বাতাসেরও যে ওজন আছে, এই ব্যারোমিটারই তা প্রথম প্রমাণ করল। এর থেকে আরও জানা গেল, কোনও পাহাড়ের উপরের বায়ুচাপ নিচের বায়ুচাপের চেয়ে কম। অর্থাৎ উচ্চতার তারতম্যে বায়ুচাপেরও তারতম্য হয়। বাতাসের গতি, উত্তাপ এবং ওজন জানার ফলে আমাদের চাষবাস, জলযাত্রা এবং ঝড়বৃষ্টির খবর পাওয়া সহজ হয়েছে।

অবশ্য যারা এরোপ্লেন চালায় তাদের কিন্তু উপরের আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানা বিশেষ দরকার। এজন্য বেশ বড় একটা বেলুনে হাইড্রোজেন গ্যাস পুরে তার মুখটা বেশ শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয়। ওর সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয় একটা ছোট্ট বেতার-প্রেরক যন্ত্র। বেলুনটা যখন উপরে উঠতে থাকে তখন এই যন্ত্র বৈদ্যুতিক বেতার ঢেউ পাঠাতে থাকে। নিচের গ্রাহকযন্ত্রে তা' ধরা পড়ে। এই-ভাবে উপরের বায়ুস্তরের অবস্থাও যন্ত্র সাহায্যে ধরা হয়।

আবহাওয়ার উপর খবরদারি

মেঘ থেকে বৃষ্টি হয় এবং বৃষ্টি থেকে আমরা জল পাই। কিন্তু সব মেঘ থেকেই বৃষ্টি হয় না। অনেক দেশের উপর দিয়ে মেঘ উড়ে যায়, কিন্তু এক ফোঁটাও বৃষ্টি হয় না। এই জন্য বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা মেঘ আর বৃষ্টি সম্বন্ধে গবেষণা করে আসছেন অনেক দিন থেকে।

গত শতাব্দীতে কেউ কেউ মনে করতেন যে, বজ্রপাতের শব্দেই বৃষ্টি নামে। এই জন্য তাঁরা ডিনামাইট, রকেট প্রভৃতির সাহায্যে প্রচণ্ড শব্দ করে যে মেঘ বৃষ্টি দেয় না, তার কাছ থেকে বৃষ্টি আদায় করবার চেষ্টা করলেন। কেউ কেউ প্রস্তাব করলেন, অগ্নি উদ্গীরণ করে বৃষ্টি নামানো যেতে পারে। অতি প্রাচীনকালে ভারত যজ্ঞ করে, ইন্দ্রের উপাসনা দ্বারা বৃষ্টি নামানোর কথা শোনা যায়।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার এক বিজ্ঞানী মেঘের মধ্যে অগ্নি উদ্গীরণ করে জানালেন—এভাবে বৃষ্টি নামানো যায়। কিন্তু সকলে তা মেনে নিলেন না।

খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণার সমষ্টি নিয়ে হয় মেঘ। যখন এই রকম অনেক জলকণা একসঙ্গে মিলিত হয় তখন ওতে বৃষ্টির ফোঁটা তৈরি হতে পারে। এই সব ফোঁটা মেঘের আকারে বাতাসে ভাসতে থাকে। এর আকারটা বড় হলে পৃথিবীর আকর্ষণে তারা বৃষ্টি হয়ে মাটিতে পড়ে।

মেঘ প্রধানত দু' রকমের হয়। গরম মেঘ আর ঠাণ্ডা মেঘ। এই দু'রকম মেঘের বৃষ্টি করবার প্রণালীও আলাদা।

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে একজন আমেরিকান বিজ্ঞানী একটা ঠাণ্ডা মেঘ থেকে সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বৃষ্টি করতে চেষ্টা করেন। তিনি কতকগুলো শুকনো বরফ (যেটা কঠিন কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছাড়া আর কিছুই নয়) উড়ো-জাহাজ থেকে মেঘের মধ্যে ফেলে দিলেন। তার ফলে উত্তাপটা নেমে গেল এবং বৃষ্টি হল।

বিভিন্ন দেশে এই প্রক্রিয়া চলল। মাত্র কয়েক পাউণ্ড শুকনো বরফ হলেই একটা বড় মেঘ তৈরি করা যেত।

আর একটা উপায়ও ইতিমধ্যে উদ্ভাবিত হল। সেটা হচ্ছে, মেঘের

সবচেয়ে উপরের স্তরে জমে যাওয়া নিউক্লিয়াই ঢুকিয়ে দেওয়া। এটা অনেক ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করাও হল। দেখা গেল, 'সিলভার আইয়োডাইডের' স্ফটিক এ ব্যাপারে খুব কার্যকরী। কিন্তু উড়োজাহাজে চড়ে মেঘের উপরে যাওয়ার খরচ পড়ে বেশি দেখে অনেকে স্থির করলেন, কয়েকটা হাইড্রোজেন বেলুনের মধ্যে বারুদের সঙ্গে সিলভার আইয়োডাইড মিশিয়ে উপরে মেঘের মধ্যে কৌশল করে ফাটিয়ে দিতে পারলে কাজ হবে। হলোও তাই।

গরম মেঘের বেলায় বিজ্ঞানীরা দেখলেন, ছোট ছোট জলকণা বড় জলকণার সঙ্গে মিশে বৃষ্টি হয়। এজন্য তাঁরা এইসব মেঘের উপর সূক্ষ্ম জলকণা ছিটিয়ে দিয়ে বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা তৈরি করতে সমর্থ হলেন। তার ফলে বৃষ্টি হল।

এর পরে সূক্ষ্ম জলকণা ছিটিয়ে দেওয়ার বদলে মেঘে লবণের সূক্ষ্ম গুঁড়ো অথবা ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ছিটিয়েও বৃষ্টি করা সম্ভব হল।

আমাদের কলকাতায় ডক্টর ব্যানার্জি ১৯৫২-৫৩ সালে বরফের মতো ঠাণ্ডা জল এবং ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড কণা গরম মেঘে চালিয়ে বৃষ্টি নামাতে পেরেছিলেন।

খরার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদের দেশে কৃত্রিম বৃষ্টির যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। সেজন্য বিজ্ঞানীরা নানারকম চেষ্টাও করছেন।

কিন্তু কেবল খরাই তো নয়—ঝড়-ঝঞ্ঝা, বিদ্যুৎপাত, শিলাবৃষ্টি, বন্যা, এ সকলও আমাদের কম ত্রাসের কারণ নয়। বিজ্ঞানীরা গত পঁচিশ বছর ধরে তা' নিয়েও চেষ্টা করে আসছেন।

প্রাকৃতিক আবহাওয়াকে হুকুম মত চালনা করা খুব সহজ কথা নয়। ঘরবাড়ী বা ট্রেনের কামরা এয়ার কণ্ডিসানড করা অথবা বাড়ীর উপর যাতে বিদ্যুৎপাত না হয়, সে জন্য নানা প্রকার ব্যবস্থা করা হলেও মোটের উপর আবহাওয়াকে বশে আনা আজও সম্ভব হয়নি। এর বড় দুটো কারণ দেখা যায়। প্রথমত এটা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ব্যাপার। দ্বিতীয়ত প্রাকৃতিক আবহাওয়ায় কখন কি ঘটবে সে সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত।

কৃত্রিম বৃষ্টির কথা আগেই বলা হয়েছে। আকাশপথে উড়োজাহাজ চালানোর পক্ষে কুয়াশাও কম বিপজ্জনক নয়। মাঝে মাঝে কুয়াশার জন্য দুর্ঘটনাও ঘটে থাকে। এই কারণে কুয়াশা অপসারণ

বিশেষ জরুরী।

আমাদের দেশে ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরী এবং ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব্ ট্রপিকাল মেটেরিওলজি এজন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন।

শেষের দিকে দু'চার কথা

আগে যা সহজ ছিল না, এখন তা খুব সহজ হয়েছে। এসব জেনে কারও কারও মনে হতে পারে, আগেকার লোকগুলি ছিল সব বোকা আর এখনকার লোক খুব বুদ্ধিমান!

তা' কিন্তু মোটেই নয়। তাঁদের বুদ্ধির উপর ভর দিয়েই আমরা আজ বুদ্ধিমান হতে পেরেছি। তাঁরা একতলা বাড়ী করে গিয়েছিলেন, তাই আমরা তার উপর আজ পাঁচতলা-সাততলা গড়ে তুলতে পারছি।

ধাঁ করে আঁধার ঘরে প্রদীপটা যে জ্বাললো, আমাদের মনে করা উচিত নয়—ওটা তার একার কেরামতি। তার আগে কেউ প্রদীপ গড়েছে, কেউ পলতে পাকিয়েছে, কেউ তাতে তেল ঢেলেছে। সবই প্রায় করা ছিল। পরে একজন ধাঁ করে এসে প্রদীপটা জ্বেলে ফেলল।

আগের তাঁরা প্রদীপটা জ্বালতে পারেননি কেন?

সে সুবিধা তাঁরা খুঁজছিলেন, কিন্তু পাননি।

জানা যায়, খুব প্রাচীনদের কেউ কেউ জল ফুটিয়ে খেতেন। তাঁরা জানতে পেরেছিলেন, জলের ভিতর এমন কিছু আছে, যা' রোগ নিয়ে আসে। কিন্তু কি আছে জলের মধ্যে তা' তাঁরা ধরতে পারেননি। অণুবীক্ষণ যন্ত্র তখন আবিষ্কার হয়নি।

প্রাচীন ভারতের লোক চিকিৎসাবিদ্যা ও অস্ত্রোপচারে এগিয়ে গিয়েছিলেন অনেকখানি। কোন্ গাছের কি গুণ তা' তাঁরা সবিশেষ বলে গেছেন। মরচে পড়ে না এমন লোহার কাজ তাঁদের জানা ছিল। তাঁরা আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের অনেক কথা বলে গেছেন। তাঁরা ভালো গণিত জানতেন। সময়ের অতি সূক্ষ্মভাগ তাঁরা করে গেছেন।

তবু তাঁরা একমাত্র সুযোগের অভাবে আজকালকার মত এত কিছু আবিষ্কার করতে পারেননি। এর সবচেয়ে বড় কারণ—বিদ্যুৎ-শক্তির আবিষ্কার তখন হয়নি। তাঁরা বিদ্যুতের হদিস পেয়েছিলেন, কিন্তু তাকে ধরতে পারেননি।

বিদ্যুৎশক্তির সুবিধা পেয়েই দেখতে দেখতে আবিষ্কার হয়ে

গেল—টেলিগ্রাম, টেলিফোন, সিনেমা, এক্‌স্‌-রে, রেডিও, উড়ো-জাহাজ—আরও কত কি!

আগেকার লোক অন্ধকারেও পথের হদিস দিয়ে গিয়েছেন। তাঁদের কাছে আমরা মাথা নত করি।

—